সুকান্ত
স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

SUKANTA, SMRITIKATHA O MULYAYAN

By

Krishna Chakraborty

আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

এস. বি. প্রিণ্টার্স

কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ

'উপস্থিতি' কবিতার পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

বর্ণলিপি

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

দীর্ঘ পাচ বছরের ওপর বইটি বাজারে ছিল না। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এতদিন বাদে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্বের সংস্করণের সঙ্গে এই সংস্করণের মিল খুব সামান্যই। নব কলেবরে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে এই সংস্করণটি একেবারে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের স্বীকৃতি দেওয়াই উচিত। আগের সংস্করণে সুকান্ত সম্পর্কে মাত্র একটি প্রবন্ধ ছিল, এই সংস্করণে সেখানে অতিরিক্ত পাঁচটি প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে সুকান্তর চিঠি এবং অপ্রকাশিত দুটি কবিতার পাণ্ডুলিপি, ভগ্নস্বাস্থ্য সুকান্তর একটি প্রামাণিক স্কেচ, তাঁর অপ্রকাশিত কবিতার ওপর আলোচনা ও পাঠকদের অবগতির জন্যে ঐ কবিতা দুটিও সন্নিবেশিত হয়েছে।

পূর্বের সংস্করণের অন্য প্রবন্ধ দুটির মধ্যে 'মানবতাবাদ প্রসঙ্গে গোর্কি' প্রবন্ধটি রাখা হলো, কারণ সুকান্তর কাব্য আলোচনায় আমি সর্বহারার মানবতাবাদ প্রসঙ্গ এনেছি, সেই প্রসঙ্গটি ঐ প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন' লেখাটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেছেন, "সুকান্ত সম্পর্কে অনেক কিছু আজে-বাজে লেখা বেরুচ্ছে। এতদিন বাদে সত্যিকারের একটা ভালো লেখা পাওয়া গেলো।" সুকান্ত সম্পর্কে অনেক বেশী জানেন যিনি এবং তাঁর সম্পর্কে বলবার প্রকৃত অধিকার যাঁর আছে তাঁর এই উক্তি থেকে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পেরেছি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবন্ধ দুটিতে কোনো মৌলিকতার দাবি নেই। পড়াশুনার মধ্যে দিয়ে যে তথ্য পেয়েছি তাই উপস্থিত করেছি। 'মানবতাবাদ প্রসঙ্গে গোর্কি' প্রবন্ধটিতে গোর্কির নিজের বক্তব্যই শুধু ভাষান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। প্রবন্ধটি গোর্কি জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে রচিত।

সুকান্ত,
স্মৃতিকথা
ও
মূল্যায়ন



সুকান্তর মৃত্যুর এক বছর পরে শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ও শ্রী দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত 'নতুন দিন' সাময়িক পত্রের, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
সংখ্যার (প্রথম বর্ষ : প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা) ২৩ পৃষ্ঠায়
কবি সুকান্তর এই স্কেচটি মুদ্রিত হয়।

P.O. Jadavpur College
24 Parganas

কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা সুকান্তর ব্যক্তিগত চিঠি

'অপসারণ' কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা।

'উপস্থিতি' কবিতার পাণ্ডুলিপির পঞ্চম পৃষ্ঠা।

সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আমার পক্ষে আমার নিজের কথাটা বড় বেশী এনে ফেলতে হয় সে জন্যে আমার পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে। কবি সুকান্তের কাছ থেকে আমি যা' পেয়েছি তার পরিবর্তে তাঁকে খানিকটা সাহচর্য দেওয়া ছাড়া আমার দিক থেকে আর কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না। সাময়িক পত্রের পাতায় লেখক হিসাবে আমাকে এনে উপস্থিত করেন কবি সুকান্ত। সেই থেকেই কবি সুকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমি এ যাবৎ কিছু লিখিনি, তার প্রধান কারণ মানসিক প্রস্তুতির অভাব। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে ঘূর্ণিবাত্যার মতো আমার জীবনটাও কেটে গেছে। ১৯৪৯ সালে রাজনৈতিক জীবনে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হবার সময় গুণ্ডা এবং পুলিশের হাতে মার খাওয়ার ঘটনাটা আমাকে আমার পূর্ববর্তী জীবনের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আজও সেই জীবনের অনেকখানি আমার কাছে যাকে বলে অস্বচ্ছ, দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে আমার স্মৃতি ফিরে পেতে হয়েছে, আজও অনেক কিছু ধোঁয়াটে, এমন কি আমার নিজের বাল্য-জীবনেরও অনেক কিছু স্মৃতিতে এই রকম বেদনাদায়ক রূপ নিয়ে আছে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ছাড়া আর যাঁরা এ সম্পর্কে বিশেষ অবহিত আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্ত। জেলের মধ্যে ঐ অবস্থায় আমার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করায় তাঁর একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুকান্ত সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি বার বার লিখতে গিয়েও পেছিয়ে গেছি, তার কারণ কবি সুকান্ত সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য এখন আমি দিতে পারব না, যা' আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল। সুকান্তের জীবিত কালের শেষ বৎসরটিতে আমার মতো এত বেশী সময় সুকান্তের সঙ্গে আর কেউ কাটায়নি, অবশ্য তাঁর আত্মীয়স্বজন বা আপনজনদের কথা বাদ দিয়ে। আমার সঙ্গে সুকান্তের মিলনের সূত্র হচ্ছে সাহিত্য, কাজেই ব্যক্তিগতভাবে সুকান্ত সম্পর্কে বেশী তথ্য আমার কাছে পাওয়া যাবে না, কিন্তু কবি সুকান্ত বা সাহিত্যিক সুকান্ত সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানবার সুযোগ হয়েছিল।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা মেসে কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী থাকতেন। একদিন একটা গল্প লিখে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। জগন্নাথদা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে লেখাটা সেদিন তাঁর কাছে রেখে আসি। দিন দুই বাদে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কথাপ্রসঙ্গে স্বভাবতঃই গল্পটার কথা জিজ্ঞেস করি। প্রশ্ন করতেই জগন্নাথদা বললেন, গল্পটা সুকান্ত নিয়ে গেছে। সুকান্তকে আমি আগে কোনোদিন দেখিনি, তিনি যে কেমন দেখতে তাও জানি না, আমার কাছে তিনি তখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। ঐ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে আমি চুপ করে যাই এবং আমাদের মধ্যে অন্য বিষয় নিয়ে কথা হতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে আর একজন সাক্ষাৎ-প্রার্থী এসে উপস্থিত হলেন। খুব একটা নজরে পড়বার মতো চেহারা নয়, গায়ের রঙ কালোই বলতে হবে, স্বাভাবিকের থেকেও বেশী রোগা এবং ওপরের দাঁতগুলো একটু উঁচু। ঘরে ঢুকেই তিনি একগাল হেসে আমাদের মধ্যে এসে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জগন্নাথদা বললেন, এই যে সুকান্ত। এর পর আমার সঙ্গে সুকান্তের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুকান্তকে বললেন, তোমায় যে গল্পটা দিয়েছি তা' এর লেখা। সুকান্ত তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে, আমি সেটা ছাপতে দিয়ে দিয়েছি। কোথায় ছাপতে দিয়েছেন সেই পত্রিকার নামটিও আমাকে বললেন। প্রথম পরিচয়েই আমার চমক লাগল। এর আগে আমার কোনো লেখা ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি। গল্পটি ভালো লাগার অপেক্ষা না করে তিনি সেটাকে ছাপবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নতুন লেখকের এত বড় পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় আর একজন আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। সুকান্তকে সেদিন সারাক্ষণ আলাপ আলোচনার মধ্যে আমি বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। যাঁরা কবি সুকান্তকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন তাঁর কথাবার্তা এবং চোখের দৃষ্টিতে কি অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য —আর ঐ মিষ্টি হাসি, একেবারে মন কেড়ে নেওয়া হাসি। ঐ হাসি শুধু সুকান্তের নয়, প্রশান্ত, অশোক, মুকুল এবং ওঁদের প্রত্যেক ভাইয়ের মুখে —এটা ওঁদের বংশগত। আজও প্রশান্ত, মুকুল বা অশোকের সঙ্গে দেখা হলে আমি চমকে উঠি ওদের মুখের ঐ মন কেড়ে নেওয়া হাসি এবং কথা বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গী দেখে, সুকান্তকে যেন ওদের মধ্যে দেখতে পাই। শুধু হাসি নয়, সুকান্তের কথা বলবারও একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করায়, প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ধ্বনি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতো। আমি সুকান্তর সঙ্গে কথা বলবার সময় বার বার এটা লক্ষ্য করেছি, আমার মনে হয়েছে তাঁর নিচের ঠোঁটটা চাপা হওয়ার জন্যে কথা বলবার এই বিশেষ ভঙ্গীটি রূপ নিয়েছিল। আর এরই সঙ্গে যদি তাঁর কবিতাকে মেলাই তা'হলে আরও বিস্ময় জাগে, যেমন স্পষ্টতা তাঁর মুখের কথায়, তেমনি স্পষ্টতা তাঁর কাব্যে।

এর কিছুদিন বাদে আমি কবি সুকান্তের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যাই। এত অমায়িক অভ্যর্থনা পেলাম সেখানে যেন আমি তাঁর কতকালের পরিচিত লোক। কথায় কথায় বললেন, "আপনার নামটা আমার পছন্দ না, আমি 'পদ'টা কেটে দিয়েছি। এখন থেকে আর 'পদ' লিখবেন না।" আমার গল্পটি ছাপতে পাঠাবার সময় 'কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর' 'পদ'টা কেটে দিয়ে তিনি 'কৃষ্ণ চক্রবর্তী' করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি? যে লোকটাকে তখনো তিনি চেনেন না, দেখেননি পর্যন্ত, তার নামটা পর্যন্ত সংশোধন করে তার লেখাটা ছাপতে পাঠিয়ে দিলেন! কবি সুকান্ত আমার থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। মনে হলো আমার যত কিছু দায়-দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব যেন তাঁর ওপর বর্তেছে। আমি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছি শুনে তিনি খুশী হলেন। বললেন, "জনগণের আন্দোলনের মধ্যে থাকবেন তা'হলেই জনগণের লেখক হতে পারবেন।" কথাটা আমার এখনো মনে আছে এই কারণে যে, তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত ছিল ঐ কথাটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেদিন তাই এই নির্দেশটাকে মনে-প্রাণে সত্য বলে স্বীকার করতে অসুবিধে হয়নি।

সেই যুগে এই চিন্তা শুধু সুকান্তের মধ্যে নয়, প্রগতি সাহিত্যের আর একজন দিক্‌পাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটাও এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। বি. এ. পরীক্ষাটা শেষ হতেই ভাবতে শুরু করেছিলাম কি করব। ১৯৪৮ সাল। সুকান্ত তখন মারা গেছেন। একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগরের বাড়িতে গেলাম। ঘরের মধ্যে চারদিকে ছড়ানো বই-খাতা, পত্র-পত্রিকা। লেখার টেবিলেরও সেই দশা, বইয়ের গাদা, খাতাপত্র, মাসিক পত্রিকা —একটু ফাঁক নেই, টেবিলের কোন্ জায়গাটাতে যে তিনি কাগজ রেখে লেখেন তিনিই জানেন। মানিকবাবুকে আমার সমস্যার কথাটা বললাম। শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে চলে যাও। ভালো লেখা যদি লিখতে চাও শ্রমিক আন্দোলন করতে চলে যাও। আমার যদি বয়স থাকত আমি তাই যেতাম। না হয় দশ বছর কিছু নাই লিখলে!"

সেদিনের সুকান্ত মানিকের চিন্তাধারা কি ছিল তার একটু পরিচয় দিতে উপরোক্ত কথাগুলো এসে গেলো! ঐ দুটি নাম আমার সেই সব থেকে বেশী অনুভূতিপ্রবণ বয়সে মনের সঙ্গে যেভাবে গেঁথে আছে, তাতে অনেক তুচ্ছ জিনিসও বৃহৎ রূপ নিয়ে স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কবি সুকান্তের বাড়িতে প্রথম যেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেদিনের কথাটা আমার বেশী করে মনে আছে এই জন্যে যে, সেদিন আমি ভীষণ উৎসাহ নিয়ে ফিরেছিলাম। এর কয়েক দিন পরে আমি একসঙ্গে দুটি গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে সুকান্তের কাছে পৌছে দিই। ফিরে এসে খুব আশঙ্কার মধ্যে দুটো দিন

কাটাই —না-জানি গল্প দুটো কি রকম হয়েছে। দুটো দিন বাদে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তিনি বললেন, "আপনার গল্প দুটি 'পরিচয়' পত্রিকার উপযোগী হয়েছে। আমি চিঠি লিখে 'পরিচয়'-এ পাঠিয়ে দিয়েছি।" আমি জানি না, কোনো নতুন লেখকের ক্ষেত্রে এই রকম তৎপর পাঠক আজ পর্যন্ত কখনো দেখা দিয়েছেন কিনা, কিন্তু এই ছিলেন সুকান্ত। তখনকার দিনে নতুন লেখকের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এ গল্প প্রকাশিত হওয়া মানে ছিল হাতে স্বর্গ পাওয়া। এটা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। সুকান্ত 'পরিচয়'-এ কার কাছে চিঠি লিখেছিলেন আমি জানি না, মনে হয় প্রফুল্ল রায়ের কাছে অথবা গোপাল হালদারের কাছে। অল্প কিছুদিন বাদেই গোপাল হালদারের কাছ থেকে ডাক এলো, ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করলাম। বললেন, 'রেষ্টুরেণ্টের বয়' গল্পটি (পরে নাম বদলে 'মহাযুদ্ধের পরে' করা হয়েছে) তাঁদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। 'পরিচয়' সম্পাদকমণ্ডলীতে তখনকার বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক শিল্পীদের সমাবেশ হয়েছিল —একে একে তাঁদের সকলের সঙ্গে এ-বার আমার পরিচয় হলো। গোপাল হালদারই 'স্বাধীনতা' অফিসে লেখক হিসাবে আমাকে শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুকান্ত যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, তার পরিচয় আমি দিনে দিনে লাভ করেছি। এর পরেও কবি সুকান্ত চিঠি লিখে লিখে আমার গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে থাকেন, প্রাণতোষ ঘটকের কাছে চিঠি লিখে 'বসুমতী'তে গল্প পাঠান, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি লিখে 'গল্পভারতী'তে গল্প পাঠান —এমনিভাবেই চলতে থাকে।

সুকান্তের অনুজ অশোক তার 'কবি সুকান্ত' বইতে লিখেছে, "আর প্রতিদিনই একটা করে গল্প লিখে হাজির হতেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী।" অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়িয়েছিল। একটা দিন না গেলে সুকান্তকে কৈফিয়ত দিতে হতো, নির্দিষ্ট দিনে গল্প লিখে নিয়ে না যেতে পারলে কেন লিখতে পারিনি তার কারণ বলতে হতো। সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হতো আমাদের মধ্যে, দেশী বিদেশী নানা লেখকের প্রসঙ্গ উঠত, বিশেষ কারো বই, যা' আমরা কেউ পড়িনি, তা' সংগ্রহ করতে পারলে তো কোনো কথাই নেই। এই সময়ে সুকান্তের প্রভাব আমার ওপর এই পর্যায়ে পৌঁছায় —এত বেশী সুকান্তের ভক্ত হয়ে পড়ি যে, তাঁর হাতের লেখা পর্যন্ত তখন আমি অনুকরণ করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। এটা যে সচেতনভাবে তা' নয়, যেন আমার সম্পূর্ণ অজান্তে ঘটে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। আর সুকান্তের হাতের লেখাটা যে কত সুন্দর এবং লোভনীয় তা' আজ কাউকে বলে বোঝাতে হবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে। খুব চাপ দিয়ে এবং পীড়াপীড়ি করে আমি সুকান্তকে দিয়ে একটা ছোটগল্প

লিখিয়েছিলাম। তাঁর ঐ গল্পটি এবং আমার একটি গল্প আমি একসঙ্গে 'অরণি' পত্রিকার অফিসে নিয়ে যাই। কবি অরুণ মিত্র তখন পত্রিকাটি চালাতেন, সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কারণ এর আগে আমার দু'একটি গল্প ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। অরুণবাবুর হাতে গল্প দুটি দিয়ে আমি বললাম, 'একটা আমার, একটা সুকান্তর।' অরুণবাবু লেখা দুটি হাতে নিয়ে বললেন, 'দুটোই তো দেখছি একই হাতের লেখা, কোন্‌টা কার?' দু'জনেরই নাম সই করা ছিল গল্পের শেষে। গল্পের নামটি আমি ভুলে গেছি, খুব সম্ভব সুকান্তের গল্পটি আগে এবং আমার গল্পটি পরে, এইভাবে আগে পিছে 'অরণি' পত্রিকায় গল্প দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুকান্ত গল্পের শেষে মোপাসাঁ ধরনের surprise বা চমক দেবার রীতির খুব ভক্ত ছিলেন এবং ঐ গল্পটিও সেই রীতিতেই লেখা।

এই সময়কার সুকান্তের লেখা পড়লে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, সুকান্ত তাঁর চারদিকে যা' কিছু দেখছিলেন তার মধ্যেই গর্বোন্মাদ শোষক ও অত্যাচারীর পতন এবং পদানতের বিদ্রোহী মূর্তি দেখতে পাচ্ছিলেন, সে হোক না সিগারেট, হোক না সিঁড়ি, হোক না দেশলাই কাঠি। একদিন সুকান্ত আমার হাতে একটি কবিতা দিয়ে বললেন, 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়ে আসতে হবে। কবিতাটির নাম 'চারাগাছ'।

তিনি তখন একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। চলাফেরা একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিছানায় পূব দিকে মাথা দিয়ে তিনি শুয়ে থাকতেন, পায়ের দিকে ছিল খোলা জানালা, জানালা দিয়ে দেখা যেত পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশে অশ্বত্থ চারা, একটার পর একটা শিকড় বিস্তার করে দিয়েছে সে দেওয়ালের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ঐ অশ্বত্থের চারাকে আমিও দেখতাম—না দেখে উপায় ছিল না। বাড়িটা বড় ঘেঁষাঘেঁষি, একেবারে জানালার লাগোয়া। কবিতাটি সুকান্ত হাতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেললাম, পড়তে গিয়ে চমকে উঠলাম, অশ্বত্থের চারাটি কবিতায় সম্পূর্ণভাবে ধরা দিয়েছে।

"অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।"

একেবারে বাস্তব চিত্র। কিন্তু তখনকার বাঙলাদেশের পটভূমিতে আরও বাস্তব হয়ে উঠেছে কবির মনে যে সত্য, অশ্বত্থ চারা তো কেবল সেই সত্যেরই ধারক—

"দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে জমে দেহে শক্তির বারুদ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।"

আর এই অশ্বত্থ শিশুরা রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের ধারায় জন্মেছে বলে—ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।

দিনের পর দিন সুকান্তের চোখের সামনে থেকে থেকে ঐ অশ্বত্থ চারা প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

প্রাণতোষ ঘটকের কাছে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশের জন্যে কবিতাটি দিয়ে এলাম। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আর একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আমি করবো। কবিতাটির জন্যে পারিশ্রমিক আনতে যেতে হয়েছিল আমাকে। সুকান্ত প্রাণতোষ ঘটকের নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। চিঠির দুটো লাইন এখনো আমার মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার কবিতার পারিশ্রমিক এখন বাজারে ১০ টাকার স্থলে ১৫ টাকা ধার্য হয়েছে। আশা করি আপনার পত্রিকা আমার পারিশ্রমিক সম্পর্কে নতুন করে বিবেচনা করবেন।' —এক আধটা শব্দের হেরফের হতে পারে কিন্তু লাইন দুটি হুবহু এই রকম। লেখার বাজার দর সম্পর্কে এই আবেদন আমাদের দেশের লেখকদের জীবনের একটা বেদনাময় দিক। প্রাণতোষ ঘটককে চিঠিটা দিয়েছিলাম এবং তিনি চিঠিটা পড়ে পনেরো টাকা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই পারিশ্রমিক আনতে যাবার সময় লেখক শ্রী হিমানীশ গোস্বামীও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

'চারাগাছ' ধরনের প্রত্যেকটা কবিতা সম্পর্কে সুকান্তের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। তিনি তখন যে দিকেই তাকাচ্ছেন সেদিকেই উদ্ধত স্পর্ধাকে ভেঙে পড়তে দেখছেন, দেখছেন নিপীড়িতের বিদ্রোহ।

শুয়ে শুয়ে খোলা দরজা দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন কবি সুকান্ত, আর হয়ত পদধ্বনি শুনবার জন্যে কান পেতে থাকতেন। যদি কেউ আসে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমারও প্রথম প্রথম বেশ ভয় করত, পড়ে যাবার ভয় —সত্যিই পদস্খলন হবার মতোই সিঁড়ি। কবি সুকান্ত তাঁর 'সিঁড়ি' কবিতাটিতে সেই গর্বোদ্ধত অত্যাচারীর পতনের স্বপ্নই দেখেছেন।

আমি আগেই বলেছি, এই ধরনের কবিতার পটভূমি তখনকার বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষ। ১৯৪৬-৪৭-এর বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষ গর্বোদ্ধত অত্যাচারীর পতনের স্বপ্নই দেখেছে। যতই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চক্রান্ত সফল হোক না কেন, সমগ্র দেশের মানুষ তখন গর্বোদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ তথা বৃটিশরাজের পতনের স্বপ্নই দেখছে, তার মনে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন। ইংরেজ কেন দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করলো তার কারণ যে যাই গবেষণা করুক, আমরা তখনকার কলকাতার অধিবাসী তার কারণ ভালো করেই জানি। অগ্নিগর্ভ বাঙলাদেশ, ক্রমে অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ, আজাদ হিন্দ দিবস, রশিদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, বন্দীমুক্তি আন্দোলন। কলকাতার রাস্তায় চলেছে প্রতিদিন রক্তের হোলি খেলা —পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে, অলিতে-গলিতে চলছে প্রতিরোধ, মিলিটারী আর পুলিশের সঙ্গে লড়াই, প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ-বিদ্রোহ। শত্রুর সঙ্গে লড়াই এবং জান দেওয়া যেন হেলাখেলায় পরিণত হয়েছে। অত্যাচারী

সাদা চামড়া সাহেবদের ভয় এবং দাপট ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সাদা চামড়ার সঙ্গে কালো চামড়ার সাহেবদেরও সেই অবস্থা, কলকাতার রাস্তায় টুপি-টাই এবং প্যাণ্ট পরে চলবার সাহস কারো নেই —ওগুলো যে নিষ্ঠুর অত্যাচারী গর্বোদ্ধত সাদা চামড়া ইংরেজের প্রতীক ! কাতারে কাতারে মানুষ এসে লড়াইয়ের ময়দানে সমবেত হচ্ছে, হেলায় প্রাণ দিচ্ছে, স্কুল-কলেজে ক্লাস হয় না, এসে জড়ো হওয়া মাত্রই —চলো ধর্মতলা, দিতে হবে এক নদী রক্ত ! মহামান্য ব্যক্তিরা যতই বলুন অহিংস আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে, যারা চোখে দেখেনি সেইসব মানুষকে হয়ত এই মিথ্যার বড়ি গেলানো যাবে, কিন্তু আমরা দেখেছি কলকাতার রাস্তায় ব্যারিকেডের পেছনে লড়াই, তাতে ছিল পুরোপুরি হিংসা। আমরা দেখেছি টাই-স্বন্ধ জামাটা টেনে ছিঁড়ে দিয়ে পাছায় লাথি মেরে মুখ থুবড়ে ফেলে দিতে, আর সেই সঙ্গে বলতে, 'শালা বাঙালী সাহেব।' দাউ দাউ করে মিলিটারী জীপ পুড়তে দেখেছি, দেখেছি হাতের কাছে যা' পাওয়া গেছে তাই দিয়েই মিলিটারী ও পুলিশের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করতে। চক্রান্ত সফল হয়েছিল, এ সত্ত্বেও দাঙ্গা বেধেছিল, কিন্তু মানুষের মন থেকে এ বিদ্রোহের আগুন তাতেও নেভানো যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বুকে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্বল হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভূতপূর্ব জয়যাত্রা এবং সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ ছিল আমাদের দেশের বুকে যা ঘটেছিল তার পশ্চাদ্‌পটে। জনগণের এই সংগ্রামের মধ্যে থেকে উঠে এসেছিলেন যে কবি, তিনি অশ্বত্থের চারা, সিঁড়ি, সিগারেট, দেশলাই কাঠি —যা দেখছিলেন চারদিকে, সমস্ত কিছুর মধ্যে তখন তা' ছাড়া আর কি দেখতে পারতেন ?

অশোক তার লেখা 'কবি স্বকান্ত' বইটা আমাকে দিয়েছিল, তাতে একটা বিষয় বাদ গিয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয় সেটা সন্নিবেশিত হয়েছে ধরে নেব। সেটা স্বকান্তর কলম। স্বকান্তর একটা কলম ছিল, তার খাপটা ফেটে যাওয়ায় সুতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হতো। স্বকান্ত এই সময় কয়েকটি ভালো ভালো কলম উপহার পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শেষ লেখাটি পর্যন্ত তিনি সেই পুরনো কলম দিয়েই লিখেছেন। যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল থেকে ৮।৪।৪৭ তারিখে* যে পত্রটি তিনি আমাকে লেখেন, সেও ঐ কলমেই লেখা। কলমটির প্রতি তাঁর

* স্বকান্তের হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা যখন স্থির হয়ে গেছে তখন আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে যশোহরে আমাদের বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিল। পরে যশোহর থেকে ফিরে এসে দেখি হাসপাতাল থেকে স্বকান্তর ৮।৪।৪৭ তারিখে লেখা চিঠিটা বাগবাজারের বাসার ঠিকানায় এসেছে। চিঠিটাতে তাঁর নিঃসঙ্গ অবস্থাটার চিত্রটি খুবই পরিষ্কার।

বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিল তার নিবটা —তাঁর যে ছবির মতো অক্ষরে গোটা গোটা লেখাগুলো, তার পক্ষে ঐ নিবটি খুবই উপযোগী ছিল। আর তাঁর 'কলম' কবিতাটির উৎসও ঐ কলম—

"হে কলম! হে লেখনী! আর কতদিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?"

তাই কলমের প্রতি কবির আহ্বান—

"কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে
ধর্মঘট করো।"

মাথা নিচু করে থাকবার দিন শেষ। মাথা উঁচু করে বিদ্রোহ করবার দিন এসেছে। এখনো যদি কেউ মাথা নিচু করে থাকে তবে তাকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। সে আহ্বানই এসেছে কবির কাছ থেকে।

কবিতার ক্ষেত্রে সুকান্ত একটা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার দুটি ফসল: 'প্রার্থী' ও 'একটি মোরগের কাহিনী'। জানি না আমি তাঁর প্রথম শ্রোতা কিনা। একদিন সুকান্ত তাঁর মাথার বালিশের নিচ থেকে টেনে বের করলেন তাঁর সেই লম্বা কবিতার খাতা, কবিতা দুটি পড়ে শোনালেন। 'প্রার্থী' কবিতার মধ্যে যে আর্তি, তা' আমাদের এই দেশের রিক্ত হতভাগ্য মানুষের জীবনের আর্তি এবং তা' ব্যক্ত হয়েছে তাদেরই নিজের ভাষায়—

"হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!"

কিন্তু সেই শীতার্ত মানুষের মুখে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে, তা' শুধু 'উত্তাপ আর আলো দিও'তে থেমে থাকেনি। এ কবিতা সুকান্তর কবিতা বলে চিহ্নিত হবে এই জন্যে যে, এতে বলা হয়েছে—

"তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

এই প্রার্থনার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নেই, এই প্রার্থনা বলিষ্ঠ, এই প্রার্থনায় পুরুষকার একটুও খর্ব হয়নি।

এরপর একদিন আমি এবং সুকান্ত গল্প করছি এমন সময় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এলেন। সুকান্ত উঠে বসলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দু'চারটে কথার পরেই তিনি বালিশের নিচ থেকে সেই লম্বা খাতাখানা বের

করলেন। বললেন, 'কবিতার ক্ষেত্রে আমি এক ধরনের নতুন experiment করছি সুভাষদা। আপনাকে কবিতা দুটি পড়ে শোনাই।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'পড়।'

খুশী হয়ে কবিতা দুটি পড়ে শোনালেন সুকান্ত। তারপর তাকালেন শ্রোতার মুখের দিকে।

কবি সুভাষ বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

কথার মোড় এরপর অন্য দিকে ঘুরে গেলো।

সুকান্ত এক সময় আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই নতুন লেখককে এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।' কবি সুকান্ত হয়ত জানতেন না যে, তার আগেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে যেতে সুকান্ত বললেন, 'সুভাষদা যখন কিছু বললেন না, তখন বোধহয় খুব একটা খারাপ হয়নি।'

আমি বললাম, 'কেন, তিনি তো বললেন বেশ হয়েছে। সুকান্ত চুপ করে রইলেন।

দুটি কবিতাই এরপর একদিন আমি নিয়ে গিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রফুল্ল রায়ের হাতে দিয়ে এলাম। কবিতা দুটি যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়ায় সুকান্ত আমাকে পাঠালেন খোঁজ নিতে। বললেন, হয়ত ওঁদের পছন্দ হয়নি, তাই ছাপা হয়নি। একবার গিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসুন।

'পরিচয়' অফিসে গিয়ে প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, 'প্রার্থী' কবিতাটি হারিয়ে গেছে তাই ছাপানো সম্ভব হয়নি। ফিরে এসে সুকান্তকে বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একখানা ফুলস্কেপ কাগজে কবিতাটি আবার কপি করে দিলেন। পরের দিন কবিতাটি নিয়ে যখন 'পরিচয়' অফিসে গেলাম প্রফুল্ল রায় বললেন, কবিতাটি পাওয়া গেছে। সেই থেকে দ্বিতীয় কপিটি আমার কাছেই ছিল, বহুকাল যত্নের সঙ্গে সেটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রক্ষা করেছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির ঝড়-ঝাপটায় তাঁর আরও তিনখানা মূল্যবান চিঠির সঙ্গে সেটিও যে কখন খোয়া গেছে জানি না। সব সময় সেই বেদনাটা কাঁটা হয়ে মনে গেঁথে আছে।

আর একটি তথ্য আমি এখানে উপস্থিত করব। একদিন ন্যাশনাল বুক এজেন্সির বইয়ের দোকানে বিদেশী সাময়িক পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ল্যাংস্টন হিউজের Labour Storm বলে একটি কবিতা আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি কিনে ফেললাম। ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে যতদূর স্মরণ হচ্ছে পত্রিকাটির নাম ছিল *Masses and Mainstream* আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি বামপন্থী পত্রিকা। পত্রিকাটি নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে সুকান্তর কাছে চলে গেলাম। কবিতাটি পড়ে সুকান্ত একেবারে লাফিয়ে

উঠে বসলেন। বললেন, আমি অনুবাদ করব। পত্রিকাটি আমি সেদিন তাঁর কাছেই রেখে এলাম। পরের দিন গিয়ে দেখি তিনি কবিতাটি অনুবাদ করে ফেলেছেন। অনুবাদটি আমাকে তিনি পড়ে শোনালেন। একটা জায়গার একটা শব্দ সম্পর্কে আমি আপত্তি করেছিলাম, আজ আর মনে নেই সেটি কোন শব্দ এবং তার ইংরেজি প্রতিশব্দই বা কি ছিল। সুকান্ত আপত্তিটা মেনে নিয়ে একটি প্রস্তাব দিলেন, সেই অনুযায়ী ঐ অর্থ প্রকাশ করে বেশ কয়েকটি শব্দ কাগজের ওপরে লেখা হলো এবং পরে আমরা ঐক্যমত হয়ে তার মধ্যে থেকে একটি শব্দ মনোনীত করলাম। 'মজুরের ঝড়' কবিতাটি অনুবাদ করার পর তিনি বলেছিলেন, ঐ রকম কবিতা আরও পেলে আমি যেন তাঁর কাছে নিয়ে যাই, তিনি অনুবাদ করবেন। সে সুযোগ আর হয়নি।

এবার সুকান্তর কবিতার মূল্যায়ন সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। ১৯৫২ সালে সুকান্তর জন্মদিবস উপলক্ষে একটি সভাতে আমি প্রথম যাই। ১৯৫১ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসার পর বিভিন্ন জায়গায় সুকান্ত সম্পর্কে কয়েকটা লেখার মধ্যে আমি একটি বিষয় খুব ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম, সে সম্পর্কে আমি মুখে অনেকের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছি। ১৯৫২ সালে সুকান্ত জন্মদিবস সভাতে একজন বক্তা সুকান্তের কাব্যকে কিশোর কবির কাব্য বলে উল্লেখ করলেন এবং সুকান্তকে বললেন কবি কিশোর। আর একজন সুকান্তকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যধারার অনুসারী বলে মন্তব্য করলেন। দুটো বক্তব্য সম্পর্কেই সেদিন আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। মনে হলো, অনেক দিন ধরে এই বক্তব্য বাঙলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং অনেকে তাকে মেনেও নিয়েছেন। আমার সন্দেহ হয় প্রথম বক্তব্যটা কোনো মহল থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে রাখা হচ্ছে কিনা। ছোট ছেলে কবিতা লিখেছে, আহা যা' লিখেছে ভালোই, তবে যা বলেছে সেই বক্তব্যটায় বিশেষ গুরুত্ব দেবার দরকার নেই, পরিণত চিন্তা তো তখনো রূপ নেয়নি, বেঁচে থাকলে ভালো কবিতা লিখত —এবং সেই সঙ্গে এই মতবাদের প্রচারকরা হয়ত আশা করেন তখন সুকান্তের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভোঁতা হতে আসত!

বাঙলা সাহিত্যের কাব্যের প্রবহমানতার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছে মধুসূদন, নজরুল, সুকান্ত সমগোত্রীয় কবি। তিনজন তিনটি দ্বীপের মতো ভেসে উঠলেও বাঙলা সাহিত্যে এ একটি স্বতন্ত্র ধারা।

সুকান্ত কিশোর কবি নন, সুকান্ত পরিণত মনের কবি। এত অল্প বয়সে এই রকম পরিণত চিন্তার অধিকারী হতে শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেও সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। চিন্তায় এবং প্রকাশ ক্ষমতায় 'ছাড়পত্র' এবং 'ঘুম নেই' যদি পরিণত মনের ফসল না হয় তবে পরিণত মনের ফসল কাকে বলে আমার জানা নেই। তবে পরিণত মনের কবি হিসাবে তিনি খুব বেশী

কবিতা লিখে যেতে পারেননি এ কথা মানতে প্রস্তুত আছি। মৃত্যু তাঁকে অকালে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে শত শত কবিতা পেতাম, সেখানে হয়ত পেয়েছি একশ'-দেড়শ'। তার জন্যে তিনি কবি কিশোর হতে পারেন না তাতে এই বোঝায় না যে তিনি যা লিখে গেছেন তা' কিশোর কবির কাব্য।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের যে উচ্চকণ্ঠ ভাষণ, তাকেই আবার আমরা ফিরে পেয়েছি নজরুল এবং সুকান্তের মধ্যে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে নিয়ম নীতি এবং সমাজ ও ধর্মের নজির মিলিয়ে মিলিয়ে মেপে মেপে পা ফেলে চলে যে শক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। জয়গান করা হয়েছে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মানুষের পৌরুষ ধর্মের। সুকান্তও সেই শক্তিকেই আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

"এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।"

কারণ,

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।"

'মেঘনাদ বধ' কাব্যের পেছনে ছিল সে যুগের নবজাগরণের ভাবধারা। পুরনো অচল-অনড় সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে যুগের আন্দোলন এবং অগ্রসর ভাবধারা কবিকে করেছে বিদ্রোহী এবং উচ্চকণ্ঠ। মধুসূদনের প্রতিভা হারিয়ে যায়নি, বাঙলাদেশের গণমানসে যখনই আবার বিদ্রোহ রূপ নিতে আরম্ভ করেছে তখনই আবার সেই প্রতিভা জন্ম নিয়েছে। আমি এখানে কবি হিসাবে সার্থকতা মধুসূদনের কতখানি, নজরুলের কতখানি বা সুকান্তের কতখানি সে বিচারে যাচ্ছি না, কিন্তু বাঙলাদেশের প্রতিটি বিদ্রোহের সন্ধিক্ষণে আমরা মধুসূদনকে পেয়েছি, পেয়েছি বিদ্রোহী কবি নজরুলকে, বিদ্রোহী কবি সুকান্তকে। বাঙলাদেশের একটা বিদ্রোহের জোয়ারে এসেছেন 'অগ্নিবীণা'র কবি; আর একটা বিদ্রোহের জোয়ারে এসেছেন 'ছাড়পত্র'-এর কবি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে যদি 'সূর্য' বলা যায়, তা'হলে এঁরা হলেন স্ফুলিঙ্গ। এঁরা দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেছেন। যেমন কাব্য-জীবনে, তেমন ব্যক্তিগত জীবনেও। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অর্ধ শতাব্দীরও বেশী ব্যাপ্ত সময়-সীমায় সমগ্র দেশের চিন্তা ভাবনা, হাসি-কান্না, ভালোবাসা, ঘৃণা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ কাব্যমূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ, এঁরা অপূর্ণ—পূর্ণতাকে রূপ দেওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সম্ভব ছিলও না।

নজরুলের সঙ্গে সুকান্তর পার্থক্য আছে। সুকান্ত থেকে নজরুল অনেক বেশী রোমান্টিক। সেই যুগের জাতীয় আন্দোলনের উচ্ছ্বাস, ভাবতারল্য ও বিক্ষিপ্ত

চিন্তার ছাপ আছে তাঁর কাব্যে এবং এ কথা স্বীকার করতে রাজী আছি যে তিনি শিল্পরীতির প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিলেন। এটা কবি নিজেও জানতেন এবং তার কারণটা তিনি নিজেই বলে গেছেন—

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না,
বড় বিষ জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাই যাহা আসে কই মুখে।"

নজরুল চীৎকার করে কথা বলেছেন, তাঁর বিদ্রোহ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মূলত রোমান্টিক মনের কবি বলে 'বিদ্রোহী' কবিতাতে এই বিদ্রোহ রোমান্টিক রূপ নিয়েছে—

"আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
আমি মহাভয় আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !"

এই হলো নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ। জগতের কোনো নিয়মকে তিনি মানেন না, সমস্ত নিয়ম কানুন শৃঙ্খলকে তিনি ছিঁড়ে ফেলতে চান, কিন্তু তা' হলেও এ বিদ্রোহের লক্ষ্য কিন্তু স্থির, লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এই বিদ্রোহ কবে শান্ত হবে ? কবি বলছেন—

"মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—"

সুকান্তে এই বিদ্রোহ আরও পরিণত রূপ নিয়েছে। এসেছে দৃঢ় প্রত্যয়, রোমান্টিকতা খসে পড়েছে, মাটির সঙ্গে কবির সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে, এসেছে বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টি—

"স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এস সব—
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?

নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ॥"

এখানে বিদ্রোহের যা' স্বরূপ তা' নজরুল থেকে আর একটা ধাপ এগিয়ে। নজরুলের বিদ্রোহ অনেক পরিণত রূপে সুকান্তের বিদ্রোহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নজরুলের ঋজুতা স্পষ্টতা এবং সোচ্চার কণ্ঠ এসে যুক্ত হয়েছে সুকান্তের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। সুকান্ত কবি হিসাবে আরও বেশী মাটির কাছাকাছি। বাঙলা কাব্যে শ্রেণীচেতনার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের রচনায়, কিন্তু নজরুলের সময়কার যে স্তরে মুক্তি-আন্দোলন এবং সুকান্তের সময়ে যে স্তরে মুক্তি আন্দোলন, তাদের মধ্যে একটা চরিত্রগত পার্থক্য আছে। সুকান্তের সময়ে শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে এবং তাদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। মুক্তির স্বপ্ন আরও স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ রূপ নিয়েছে, স্বপ্ন হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষ, বাস্তব। কবি তাই বন্ধুকে নিজের ঠিকানা বলতে গিয়ে বলেছেন,

"এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো।"

'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা 'বিদ্রোহের গান' এবং 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী'-র মধ্যে নজরুলের কিছু কিছু উক্তির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এই বিদ্রোহ-চেতনা যে নজরুলকে ছাড়িয়ে গেছে, তারও পরিচয় ঐ কবিতা দুটির মধ্যেই আছে। রোমান্টিক হতে গিয়েও সুকান্ত রোমান্টিক হতে পারছেন না। 'কবিতার খসড়া'তে তিনি অপূর্ব রোমান্টিক আবেগের পরই দ্বিতীয় স্তবকে আবার মাটিতে নেমে এসেছেন। সুকান্তের বিদ্রোহ তাই রোমান্টিক বিদ্রোহ নয়। 'বিদ্রোহের গান'-এর নিচের স্তবকের মধ্যেও রোমান্টিক আবেগ নেই, আছে তখনকার দিনের বাস্তব সত্যেরই প্রতিফলন—

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ।"

মধুসূদন-নজরুল-সুকান্ত, তিন যুগের তিন কবি বিদ্রোহের তিনটি চরিত্রকে ধারণ করে আছেন। এই সুকান্তকে যাঁরা কিশোর কবি বলেন, তাঁদের সততায় সন্দেহ প্রকাশ না করে পারা যায় না। '১লা মে-র কবিতা '৪৬' যদি কিশোর

কবির রচনা হয়, তবে পরিণত মনের কাব্যবস্তুটি কি সেটা জানবার প্রয়োজন আছে।

"তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,"

এই বিদ্রোহ যাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তাঁরাই সুকান্তের প্রতি ছদ্ম-প্রীতির গদগদ গলা নিয়ে তাঁকে স্নেহের কিশোর-কবি বলে পিঠ চাপড়ে রাখতে চান। তাঁদের আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যেই সুকান্ত তাঁর বিদ্রোহকে স্পষ্ট করে রূপ দিয়ে গিয়েছেন—

"যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ"

তাই—

"নৈঃশব্দ্যের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে॥"

সেই সমস্ত ধূর্ত সাহিত্য-পণ্ডিতদের জানা আছে যে, দিনে দিনে, এ যুগে এই কবির কাব্য বেশী বেশী করে জনগণের মনকে অধিকার করবে, তাই জনমনের ওপরে কবির প্রভাবকে যেহেতু ঠেকানো যাবে না, তাই সুকান্তকে স্নেহের 'কিশোর কবি' আখ্যা দাও। অর্থাৎ জনমনে এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করো যে, ও হলো অপরিণত কিশোরের কাব্য, চিন্তা তখনো পরিণতি পায়নি, তবে ছেলেটা লিখতো ভালো—এইভাবে জনমনে সুকান্তের কাব্যের প্রচণ্ড প্রভাবকে তাঁরা প্রতিরোধ করতে চাইছেন।

'সুকান্ত সমগ্র'-এর মধ্যে 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতাটি ঢোকানো হয়েছে। এই বিদ্রোহী কবির সমগ্র কাব্য-সাধনা সমগ্র চিন্তা-চেতনার বিরোধী এই কবিতা। যে কোনো পাঠক তাঁর কাব্য পড়ে এ কথা স্বীকার করবেন যে, সুকান্তর সমগ্র কাব্য-সাধনার সঙ্গে ঐ কবিতাটির বিরোধ তীব্র।

সুকান্তর পূর্বসূরী বিদ্রোহী কবি নজরুল পর্যন্ত গান্ধীবাদকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে ঐ মতকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। যেমন—

"সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুনি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি!"

মার্কসবাদী বিপ্লবী তত্ত্বকে যারা গান্ধীবাদ দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে চাইছে, সেই সব দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকেরা এই কবিতাটিতে তৃপ্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু আমরা জানি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির গান্ধীজী সম্পর্কিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীই এই কবিতাটির জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু কবির সমগ্র কাব্য, সমগ্র সৃষ্টি যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের মশালকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে সেখানে শ্রেণী-সমঝোতা এবং শ্রেণী সহযোগিতার তত্ত্বের ধারক গান্ধীজীর প্রশস্তি কবিতা যে এই কবির কাব্যচেতনার বিরোধী, এ সত্য কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। কবির সমগ্র সৃষ্টিই ঐ কবিতাটিকে অস্বীকার করছে।

সুকান্ত লিখেছেন—

"মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি!
হে খাতক নির্বোধ,
রক্ত দিয়েই সব ঋণ কর শোধ!"

'কনভয়' কবিতাটিতে ইতিহাসের পটভূমিতে যে বিপ্লবী জনতাকে তিনি এগিয়ে আসতে দেখেছেন, সেখানে গান্ধীজীর স্থান নেই। 'বোধন' কবিতায় তিনি যে আহ্বান জানিয়েছেন, "দু'হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা"—সেখানে ঘোষিত হয়েছে শোষকশ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, যে শ্রেণী-সমঝোতা ধনী-দরিদ্রকে সমানভাবে ভালোবাসতে বলে, সেই 'উদার ভালোবাসা' নয়। যিনি 'আদিম হিংস্র মানবিকতার' একজন হতে চেয়েছেন এবং শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধের দামামা' বাজাতে চেয়েছেন, তাঁর সমগ্র সৃষ্টি 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতাটির দৃঢ় প্রতিবাদ। এ কথা তাঁকে আরও পরিষ্কার করে বলতে শুনি, যখন তিনি বলেন, 'মুখে মৃদু-হাসি অহিংস বুদ্ধের ভূমিকা চাই না।'

এ-বার আমি আমার সর্বশেষ যে বক্তব্যে আসতে চাই, তা' হলো কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়ে থাকে তার সত্যাসত্য নির্ধারণ। যাঁরা সুকান্তকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যধারার অনুসারী বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা হয় ভালো করে বিচার করে দেখেন না, না হলে জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র মেজাজের কবি। তাঁর কাব্য বুদ্ধিদীপ্ত এবং ব্যঙ্গাত্মক। এখানে বলে রাখা দরকার আমি 'পদাতিক-চিরকুট-অগ্নিকোণ'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করছি, তার পর থেকে তাঁর কাব্যের বক্তব্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সুকান্তর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আর একটি পার্থক্য হলো, সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব বেশী ছন্দ-সচেতন কবি। ছন্দের দিকে কবির নজর খুব বেশী। ছন্দের হাল্‌কা চাল অনেক সময় ভাবের গাম্ভীর্যকে হাল্‌কা করে দিয়েছে। যেমন—

"চিমনির মুখে শোন সাইরেন-শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—

'তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।"

সুকান্তের মূল লক্ষ্য ছিল ভাবের (content) দিকে। সেই জন্য তাঁর কাব্যের আবেদন অনেক বেশী গভীর-এবং স্থায়ী। 'হে মহাজীবন' কবিতাটিতে তিনি বলেছেন—

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।"

এ কবিতায় ছন্দের চমক নেই, বাচনভঙ্গীর বিশেষত্ব নেই, আছে সত্যকে তুলে ধরবার, যুগের চেতনাকে ধারণ করবার সহজ-সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গী। এখানে সত্য উপলব্ধি আরো গভীর, আরও অন্তরঙ্গ। যে কবি বলেন—

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥"

সে কবি ছন্দের চমক এবং ধ্বনি-ঝঙ্কারকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন আরও অনেক দূরে, অনুভূতির গভীরতম উপলব্ধির জগতে। এইখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি সুকান্তের মৌল তফাত।

এমন কি বুদ্ধির চমক এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এত বেশী আকর্ষণ যে, 'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?' এই কবিতার মতো গভীর-গম্ভীর (serious) বক্তব্যের কবিতাও ছন্দের চমক এবং ব্যঙ্গের ছোঁয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁরই লেখা 'পণ্ডিতমূর্খ' কবিতাংশটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। দেখুন তো তিনি নিজে লিখেছেন বলে চিনতে পারেন কিনা—

"লেনিন, এঙ্গেলস, মার্কস নখাগ্রে আমার
উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যতম নেতা।
লক্ষ্য বড়; ধরি তাই মহাত্মার ধামা;
আনন্দ ভবনে খুঁজি মুক্তির উপায়।
প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠাণ্ডা করে দিয়েছি কেমন!
এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না;
—ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে শ্রেণী-চেতনা সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। তাঁর কাব্যে শ্রেণী-চেতনা থাকলেও ('পদাতিক-চিরকুট-অগ্নিকোণ'-এর যুগে। বর্তমানে তিনি শ্রেণীর উর্ধ্বে) সেই জলন্ত ঘৃণা কোথায়, যে জলন্ত ঘৃণা সুকান্তের

কাব্যে ? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এমন একটা কবিতা কেউ কি দেখাতে পারবেন যেখানে শত্রুর প্রতি ঘৃণা (শ্রেণী ঘৃণা), যাকে সর্বহারা মানবতার একটা প্রধান দিক বলে গোর্কি উল্লেখ করেছেন, তার প্রকাশ ঘটেছে ? নিম্নের পংক্তিগুলির মধ্যে কোথায় সে জিনিস ?

"জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জলে হাস্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও···"

সুকান্ত হলে এটা কিভাবে লিখতেন তা' অনুমান করা কঠিন নয়, অত্যাচারী এবং অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা এবং ধিক্কার সুকান্ত কিভাবে প্রকাশ করেছেন শুধু 'বোধন' নয়, তাঁর আরো অনেক কবিতা থেকেই সেটা জানতে পারা যায়। আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনো দিনই কোনো কিছুতে বিশ্বাস করেননি। সে ক্ষমতা, সে দৃঢ়তা তাঁর নেই। থাকলে আজকে তিনি সুকান্তর মতো জ্বলন্ত ঘৃণা নিয়ে দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারতেন—

"শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর
একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"

সুকান্ত ভট্টাচার্যের আরও কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখে আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানবো। কোনো কোনো কবির মধ্যে এক একটা যুগ কথা কয়ে ওঠে, যুগটাকে ধারণ করেন সেই কবি তাঁর কাব্যে। বাঙলা সাহিত্যে এই কবিরা হলেন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত। দেশের ইতিহাসের এক একটা যুগের প্রতিনিধি এঁরা।

অবাক লাগে যখন সুকান্তের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি পড়ি। কবিতাটিতে নিজের যুগটাকে কত অল্প কথায় কি সুন্দরভাবেই না সুকান্ত ধরে রেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের সঙ্গে তাঁর যুগের পার্থক্যটাই বা কত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন ! সুকান্ত বলছেন—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে
নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"

*　　　　*　　　　*

তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।"

এই হলো সুকান্তের যুগ। এই যুগের বাণীকে রূপ দিয়েছেন কবি তাঁর কাব্যে। এই যুগে মুক্তির আশ্বাস বয়ে এনেছেন কমরেড লেনিন, তাই লেনিনকে তিনি যে ভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন আর কেউ তা' পারেননি—

"অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
*　　　*　　　*
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।"

এ যুগের বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবের বাণীকার সুকান্ত, বিপ্লবের সংগঠক এবং প্রথম সারির সৈনিক অনুভব করেছেন—

"লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"

শিল্পীর জীবনে, কবির জীবনে এই অনুভব অনন্যসাধারণ একক দৃষ্টান্ত। এই সুকান্ত না-কি 'কিশোর কবি', তিনি না-কি স্নেহাস্পদ 'কবি কিশোর'।

সুকান্তের প্রতিজ্ঞা তিনি পূরণ করে গেছেন। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে গেছেন। কিন্তু এ বিশ্বকে তিনি নবজাতকের বাসযোগ্য করে যেতে পারেননি, তার আগেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। সে দায়িত্ব বর্তেছে পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের ওপর, বাঙলা সাহিত্য তাঁর উত্তরাধিকারীর বাণীর জন্যে কান পেতে আছে।

সুকান্তর কবি ভাবনা

সুকান্ত সম্পর্কে আমার লেখা 'সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের কাছ থেকে অনেক সুপারিশ এবং অনুরোধ আমার কাছে এসেছে।

বলা বাহুল্য সেই সকল অনুরোধ রক্ষা করা বা সেই সকল দাবি পূরণ করার ক্ষমতা আমার নেই। সুকান্ত বেঁচে থাকলে এখন কি হতেন বা কি করতেন সে প্রসঙ্গ একেবারেই অর্থহীন। সুকান্ত কি ধরনের কবি তার স্বাক্ষর তাঁর স্পষ্ট কাব্যে আছে, সে জন্যে এখনো যেখানেই আন্দোলন-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সেখানেই সুকান্তর কবিতা দেওয়ালে লেখা হচ্ছে, মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। শ্রেণীসংগ্রামের মশাল আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে, কাব্যজগতে আর কেউ তো এ রকম সার্থকভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেননি।

এই পরিচয়ই সুকান্তর পরিচয়, আগামী দিনেও এই পরিচয়ই থাকবে। আমরা যারা সুকান্তকে দেখেছি ও জানি তাদের কাছে এটা খুবই স্পষ্ট যে, কবি সুকান্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্মী সুকান্তের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবার আগে সুকান্তর সৃষ্টি যদি কারো কাব্যকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে তবে তা' হলো রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাঙলা সাহিত্যের কাব্যজগতে সুকান্ত ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের কবি। রবীন্দ্র কাব্যকলা তাঁর মনোজগতে সোনার কাঠির স্পর্শ ছোঁয়ালেও জেগে উঠেছেন তিনি এক স্বতন্ত্র কবিমণ্ডলীতে। একেবারে প্রথম থেকেই চিহ্নিত হয়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে সবলে অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কাব্যগ্রন্থগুলির, বিশেষ করে 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'রোগশয্যা-আরোগ্য-জন্মদিনে' প্রভৃতির বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গীর প্রভাব সুকান্তর 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের অনেক স্থানে আছে। আবার কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যও ঐ গ্রন্থেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত সুকান্তর অনেক বক্তব্যই 'পূর্বাভাস'-এ অঙ্কুরিত হয়ে পরে পল্লবিত হয়েছে। অথচ সুকান্তর কবিতায় আত্মপ্রকাশের উৎস মূলে রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা-ছন্দই যে প্রধানভাবে কাজ করেছে সে কথা অনস্বীকার্য। নিম্নের উদ্ধৃতি লক্ষণীয়—

"আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে…"

অথবা,

"হে তারুণ্য, জীবনের প্রত্যেক প্রবাহ
অমৃতের স্পর্শ চায় ; অন্ধকারময়
ত্রিকালের কারাগৃহ ছিন্ন করি,
উদ্দাম গতিতে বেদনা-বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বালাময় আত্মার আকাশে, ঊর্ধ্বমুখী
আপনারে দগ্ধ করে প্রচণ্ড বিস্ময়ে।"

এই রকম আরও অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

"দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ
বিস্ফারিত হিংস্র বেদনায়।…"

'অসহ্য দিন' কবিতায় প্রকাশভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছাপ থাকলেও ঐ কবিতাটিতেই কবি সুকান্তর 'কবি-বাণী'কেও প্রথম উচ্চারিত হতে শুনলাম। বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে সুকান্ত বলছেন—

"মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।"

পরবর্তীকালে 'ছাড়পত্র'-এ এই বেদনাই আরও তীব্র অভিব্যক্তি পেয়েছে—

"এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম।"

এই বেদনাবিদ্ধ সুকান্তই তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, এই সুকান্তই তো বলেছেন—

"স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

'অসহ্য দিন' কবিতাটিতেও এই আগুনের আঁচ পাই যখন তিনি বলেন—

"অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত !"

'জাগবার দিন আজ' কবিতাটিতে সুকান্ত বলেছেন, "আজকের দিন নয় কাব্যের !" 'মৃত পৃথিবী'তে বলেছেন সেই একই কথা—

"আজকের দিন নয় কাব্যের
পরিণাম আর সম্ভাব্যের"

এর সঙ্গে তুলনীয় 'ছাড়পত্র'-এর কবিতা 'হে মহাজীবন'—

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,

পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।"

'পূর্বাভাস'-এ যা ছিল অঙ্কুর 'ছাড়পত্র' রচনাকালে তা' পল্লবিত হয়ে সুস্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ করেছে। বৃক্ষটি যে কোন্ বৃক্ষ তা' আর চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না।

অত্যাচার-অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জনগণের সংগ্রামকে কাব্যের বিষয়বস্তু করা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা ঘোষণার বীজ 'পূর্বাভাস'-এর কবিতাগুলির মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়েছে। শ্রেণী চেতনার সুস্পষ্ট উপলব্ধির চিহ্নও এই কাব্যে বর্তমান। এই সব ভাবানুভূতিগুলিই কল্পনায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে নিত্য নব রূপলাভ করে সুকান্তর 'কবি-বাণী' হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

'সুকান্ত-সমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন তার কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কবি সুভাষ বলেছেন, "···কী নিয়ে লিখব'—এটা কখনই আমাদের আলোচনার বিষয় হত না। 'কেমন করে লিখব' —এই নিয়েই ছিল আমাদের যত মাথাব্যথা।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই স্বীকৃতিটার ওপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি। কবিতার বক্তব্য কি হবে তা' সুকান্ত যেমন স্থির করে ফেলেছিলেন, সুভাষও তাই। তবে কিভাবে বলতে হবে সেটা নিয়েই যত ভাবনা। বলার ভঙ্গীটা কিন্তু কবি নিজেই উদ্ভাবন করেন, তাই সুকান্ত যে ভাবে শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীসংগ্রামকে প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন, সুভাষ সে ভাবে করবেন আশা করা যায় না। কিন্তু পার্থক্যটা কি শুধু প্রকাশভঙ্গীতে? সুকান্তর হৃদয়ের যে তীব্র জ্বালাবোধ, শ্রেণীশত্রুর প্রতি যে তীব্র ঘৃণাবোধ, সুভাসের কাব্যে তা' অনুপস্থিত। এই জন্যেই সুকান্ত যত কাছে সুভাষ তত কাছে নন। আমার বক্তব্য হলো এই যে, 'কি করে লিখব' সেটা বিষয় নিরপেক্ষ নয়, কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই 'কি নিয়ে লিখব'—ব্যাপারটা নিয়েই কিন্তু আসলে ছিল দু'জনের মধ্যে পার্থক্য। সুভাস মুখোপাধ্যায় সমাজকে বদলাবার সংগ্রামকে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করাকে বুদ্ধিজীবীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অর্থাৎ **intellectual plane** থেকে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির প্রতি একটি উদার সহানুভতিবশত। তারই প্রতিফলন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু এবং রূপকল্পতে প্রতিফলিত। সুকান্ত সেই সংগ্রামে, সেই পার্টিতে এবং সেই বিপ্লবে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সৈনিকের অবস্থান থেকে কবিতা লিখেছেন এবং তারই প্রতিফলন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুতে এবং রূপকল্পে।

কবি সুভাষকে ছোট করে দেখবার বা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ছোট করবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আমি চাই সঠিক মূল্যায়ন। অনেকের মতো আমিও একদিন অগ্রজের মতো তাঁর স্নেহ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, ভিন্ন

রাজনৈতিক মঞ্চের কথা তখন ছিল চিন্তার বাইরে। কিন্তু কবি সুভাষের কাছ থেকে একদিন যা শিখেছি পরে তারই বিপরীত বক্তব্য শুনে বিস্মিত হয়েছি। ১৯৬৯ সালের দুটি স্মৃতি আমার মনে গেঁথে আছে। 'দেশহিতৈষী'-র পাতায় 'সীমান্ত পেরিয়ে' উপন্যাসটি সম্পর্কে সুভাষ মন্তব্য করলেন, "লেখায় তুমি বড় রাজনীতি এনে ফেলছ।"

পরে একদিন পাণ্টা প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছিল, "আপনার আগের কবিতার বক্তব্য থেকে কিন্তু এখনকার কবিতার বক্তব্য বদলে গেছে।"

সুভাষের জবাব, "বক্তব্য চিরকাল এক থাকে না। এখন যা বক্তব্য পরে যে সেই বক্তব্যই থাকবে তাও নয়।"

প্রসঙ্গটি টানলাম এইজন্যে যে 'সুকান্ত-সমগ্র'-এর ভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"···ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।

"কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত যেভাবে লিখেছিল —বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একইভাবে লিখে যেত। সুকান্তকে আমি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি বলেই জানি, এক জায়গায় থেকে যাওয়া সুকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'পূর্বাভাস' আর 'ঘুম নেই'তে অনেক তফাত। তেমনি সুস্পষ্ট তফাত 'ছাড়পত্র'-এর প্রথম দিকের আর শেষ দিকের লেখায়।"

এই উদ্ধৃতিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কবি সুভাষ হয়ত তাঁর কাব্যের বক্তব্য বদলে যাবার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন অন্যান্য মহৎ স্রষ্টার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, রমঁ্যা রলাঁ ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, রমঁ্যা রলাঁ সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে বহু ভ্রান্ত পথ পরিক্রমা করে তবে সত্যের দরজায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কেউ আংশিকভাবে, কেউ পরিপূর্ণভাবে সত্যকে লাভ করেছিলেন। তাঁরা যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন বা পৌঁছেছিলেন কবি সুভাষ কিন্তু সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে নিজের কাব্যের ভাব পরিবর্তনের সপক্ষে সুভাষের উক্তি আসলে রবীন্দ্রনাথ এবং রলাঁর পেছনে-ফেলে-আসা পথের দিকেই পিছিয়ে যাবার মানসিকতার পরিচয়বাহী। সেদিক দিয়ে এটা আরোহণ পর্ব নয়, অবরোহণ পর্ব। গোর্কি সর্বহারার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে টলস্টয়বাদে ফিরে যেতে চাননি বা তাঁর সপক্ষে কোনো যুক্তি দাঁড় করাবারও চেষ্টা করেননি। রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা কবি সুভাষের কাছে স্বতন্ত্রভাবে বিচারের বিষয়বস্তু হলো কবে থেকে?

এখন সুকান্তর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সুকান্ত বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একইভাবে লিখতেন কিনা সুভাষ সেই আলোচনার

অবতারণা করেছেন। কিন্তু এখানে শেষ দুটি পংক্তির বক্তব্য যা, তাই যদি সুভাষের বক্তব্য হয় তবে তাঁর বক্তব্য মানতে আমাদেরও বাধা নেই। 'পূর্বাভাস' আর 'ঘুম নেই'-তে যে তফাত বা 'ছাড়পত্র'-এর প্রথম দিকের আর শেষ দিকের লেখায় যে তফাত তাই যদি সুভাষের অভিপ্রেত বক্তব্য হয় তবে সেটা চলে যাচ্ছে 'কেমন করে লিখব'—এই পর্যায়ে। 'কি নিয়ে লিখব'—সে প্রসঙ্গের চূড়ান্ত সমাধানে সুকান্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, সেটা আর বিবর্তন সাপেক্ষ ছিল না। কবি সুভাষের বক্তব্য থেকে মনে হয় এ বিষয়ে তিনি নিজে যে সমাধানে পৌঁছেছিলেন সেটা ছিল সাময়িক এবং বিবর্তন সাপেক্ষ। শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা থেকে শ্রেণী-সমন্বয়ের চেতনা এবং শোষিত-অত্যাচারিত মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা থেকে উদার সর্বজনীন ভালোবাসায় উত্তরণ বা বিবর্তন কখনই চেতনার অগ্রগতি নয়, চেতনার পশ্চাদপসরণ। সুভাষ যে সুকান্তের ভবিষ্যৎ সেভাবে চিত্রিত করেননি তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হবে। নিজে তিনি কিন্তু সেই পথেই যাত্রা করেছেন এবং সচেতনভাবেই।

যাই হোক সুকান্তর কবি ভাবনা নিয়ে আমি আলোচনা করতে বসেছি, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সুকান্তের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে, যদিও বলতে গেলে তাঁর সাধনা শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে, খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাঁর কবি-ভাবনার মূল বিষয় হচ্ছে 'বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ প্রথমে জীবনের সর্বদিকের গ্লানি এবং অন্যায়কে আক্রমণ করেছে, অর্থাৎ প্রথম বিদ্রোহ পরিবেশের বিরুদ্ধে, পরে সেই বিদ্রোহ পরাধীনতা-উপনিবেশিকতা এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং এই বিদ্রোহই রূপান্তরিত হয়েছে শ্রেণী-শোষণের বিরুদ্ধে। যেখানে বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে কবি নিজেই লেনিনে পরিণত হয়েছেন। পরিবেশ সম্পর্কে কবির উপলব্ধি একদিন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছাল যে তাকে আর সহ্য করা সম্ভব নয়—

> "মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
> হৃদয়গত।
> ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
> দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।"

এই চেতনা থেকেই কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। প্রতারিত বিন্ধ্যাচলকে শির উন্নত করে দেবতাদের প্রতারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলেছেন। সারা দেশের শ্রমিক-কৃষক-জনগণের সংগ্রামী অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর কবির বিদ্রোহ-চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে বিপুল বিশ্বে। সেই সঙ্গে নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে—হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ সমগ্র দেশের বুকে সংগ্রামী মানুষকে দেখতে পেয়েছেন কবি। এই বিদ্রোহ-চেতনা কৃষকের মধ্যে, যুদ্ধ ফেরত সৈনিকের মধ্যে, এই বিদ্রোহ-চেতনা শোষিত মানুষের

মধ্যে, এই বিদ্রোহ-চেতনা থেকেই কবি সমগ্র দেশবাসীর কাছে মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন—

"সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।"

কবির এই বিদ্রোহ-চেতনাকে বুঝতে হলে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা হচ্ছে 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের "অনন্যোপায়" কবিতাটি। সুকান্তের কবি ভাবনায় বিদ্রোহ কোথা থেকে এলো তার প্রথম পরিচয় এই কবিতাটিতে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কবির অন্তর বিদীর্ণ করা অনুভূতিকে ধারণ করে আছে এই কবিতা—

"অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোর গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।
যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,"

এই বিদ্রোহ আর কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, কবির এই বিদ্রোহ সারা পৃথিবী জুড়ে। 'পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়'ই তাঁকে বিদ্রোহী বানিয়েছে। 'নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে ; ছিন্নভিন্ন মোহ'। কাজেই অন্যায়ের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে সমাজ তাকে ভাঙো —আজকের প্রধান কাজ হচ্ছে ভাঙার কাজ।

"আজকে ভাঙার স্বপ্ন, —অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।"

এই বিদ্রোহ-চেতনাই সুকান্তর কবি ভাবনায় দিনে দিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যেই বিদ্রোহকে খুঁজেছেন, কবিতার পর কবিতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহের আহ্বান—

"কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে?"

এই দু'টি পংক্তির মধ্যে কতখানি জ্বালা এবং কি পরিমাণ ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে তা' পাঠকই বিচার করবেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার সুকান্তর কবি ভাবনায় বিদ্রোহের পরেই স্থান করে নিয়েছে 'ঘৃণা'। এই জ্বালা এবং ঘৃণা থেকেই বিদ্রোহের জন্ম—

"তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের।"

এইভাবে বিদ্রোহ জমতে জমতে কবি একদিন লিখতে বসলেন তাঁর বিদ্রোহের দিন-পঞ্জিকা—

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারই দিন-পঞ্জিকা লিখে,"

সিঁড়ি, কলম, সিগারেট, দেশলাই কাঠি, আগ্নেয়গিরি সব কিছুর মধ্যেই কবি খুঁজলেন বিদ্রোহ। এইভাবে বাঙলা কাব্যে আমরা পেলাম আর একজন বিদ্রোহী কবিকে।

সুকান্তর কবি ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়বস্তু 'ঘৃণা' এবং এই ঘৃণা ছড়িয়ে আছে কবির লেখা প্রায় অধিকাংশ কবিতায়। যারা কুৎসার জঞ্জাল জড়ো করে মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করছে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন তিনি—

"যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।"

এই ঘৃণার কামান দেগেছেন তিনি ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে। সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের স্বপ্নকে যারা গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধিতার নামে যারা শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের হত্যা করে, তাদের প্রতি ঘৃণাকে প্রকাশ করেছেন তিনি এইভাবে—

"বিগত শেষ সংশয় ; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,"

অত্যাচারী, শোষক, মানবতার শত্রু এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। তিনি একখানা ঘৃণার মহাকাব্যও রচনা করে গেছেন। 'বোধন' কবিতাটিকে আমি "ঘৃণার মহাকাব্য" বলতে চাই। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্যে এর সমতুল্য সৃষ্টি নেই। নানা জনে নানা কথা বলেছেন এই কবিতাটি সম্পর্কে, কিন্তু আমি এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি হিমালয় পরিমাণ ঘৃণাকে। আর সেই ঘৃণার মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহে জ্বলে উঠবার আহ্বান ঘোষিত হয়েছে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। সর্বোপরি শ্রেণী-চেতনার শাণিত ইস্পাত ঝলসে উঠেছে কবিতাটির প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। কৃষকের ক্ষেতের ফসল চুরি করে যারা গুপ্তকক্ষে জমায় তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির বেদনাহত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা এই অন্যায়কে এতকাল নির্বিবাদে মেনে এসেছে—

"ধূর্ত. প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।"

কবি তাই বিস্মিত, কবি তাই ক্রুদ্ধ—

"তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি করে যারা গুপ্তকক্ষেতে জমায়

তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত ; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।"

কিন্তু তা' হলেও এই ধূর্ত-প্রবঞ্চক অত্যাচারী শোষকরাই কি ইতিহাসের শেষ কথা? বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কবি ভালো করেই জানেন এদের ধ্বংস অনিবার্য এবং মেহনতী মানুষের হাতেই সেটা ঘটবে—

"...শোনো হে দুনিয়াদার !
... ...
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার :"

এর পরের স্তবকেই কবি সমস্ত শোষিত মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন—

"লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই।"

এই কবিতাটি আলোচনা করতে গেলে সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তারপর আর বলার কিছুই থাকে না। কতখানি ঘৃণা এবং ক্রোধ বুকে জমা হলে তবে নিচের পংক্তি কটি লেখনীর মুখে বেরিয়ে আসতে পারে তা' কল্পনা করা যায় কি ?

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।"

এই পংক্তিগুলো পড়বার পর কোন্ পাঠকের রক্ত না উদ্দাম হয়! এই ঘৃণা এই ক্রোধ ধার করে পাওয়া যায় না। ক্ষুরধার-দীপ্ত চেতনায় শোষিত মানুষের একজন হতে পেরেছেন যে কবি তাঁর পক্ষেই এইভাবে লেখা সম্ভব।

কবিতাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পংক্তিতে ছড়িয়ে আছে এই ঘৃণা এবং দৃপ্ত পৌরুষ। কবি অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে যুদ্ধ হবে নিষ্ঠুর নির্মম। একটা শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থেকে হঠিয়ে নতুন

শ্রেণীকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করার যে যুদ্ধ তার রূপ যে নির্মম এবং ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য তা' কবি মানেন এবং জানেন বলেই কোনো রকম মোহ না রেখে ঘোষণা করেছেন—

"দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,"

এই পংক্তিটির মধ্যে কোনো মুখোস আছে কি? আছে কি কোনো ধোঁয়াটে ভাব? আছে কোনো ইনিয়ে-বিনিয়ে সাধু কাব্য লিখবার চেষ্টা? না, নেই। এবং এর পরই কবি সেনাপতির মতো হুকুম জারি করেছেন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী জনগণের উদ্দেশ্যে। কি সে হুকুম? শ্রেণী-সংগ্রামের আপোষহীন সেনাপতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নির্দেশ ভারতবর্ষের শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি—

"টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"

আর যদি তা' না হয়? যদি তুমি এই নির্দেশ না মানো? তা'হলে কবির হিমালয় পরিমাণ ঘৃণার সামনে দাঁড়াবে তুমি—

"তা যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই॥"

এই হলো সুকান্তের ঘৃণা, এই হলো সুকান্তের ক্রোধ, এই সুকান্তের বিদ্রোহ। 'বোধন' কবিতাটিতে এই সব কিছুর ঘটেছে এক অপূর্ব সমন্বয়, কিন্তু কবিতাটির মধ্যে সব কিছুর পেছনে যেটা পর্বতের মতো অটল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা' হলো 'ঘৃণা'। তাই এ কবিতা হলো 'ঘৃণার মহাকাব্য'।

সুকান্তের কবি ভাবনার তৃতীয় বিষয় হলো 'আশাবাদ' যার ভিত্তি হলো বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আস্থা। এই আশাবাদই কবিকে সমস্ত কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভগ্নোদ্যম করেনি, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কাব্যে। তিনি জানতেন, 'একদিন সে সকাল আসবেই।' যুদ্ধোত্তর কলকাতা যখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কলঙ্কে পঙ্গু, যে কলকাতায়—

"গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান;
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্‌খান্‌।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত;"

এবং কবি যেখানে বুঝতে পারছেন—

"জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা !"

সেখানেও কবি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশ্বাস ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবি নিশ্চিত আস্থাকে ঘোষণা করেছেন। যে মানুষ সংগ্রাম করছে, শোষিত নিপীড়িত সেই মানুষের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কে কবির মনে কোনো সংশয় নেই। পৃথিবীর জঞ্জাল সরাতে সরাতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেও সেই জঞ্জাল একদিন যে অপসারিত হবেই এবং তিনি সেই ইতিহাসেরই যে অঙ্গীভূত হবেন এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন।

সুকান্তের ব্যক্তিত্ব

সুকান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে তাঁর লাজুক ও মুখচোরা স্বভাবের ওপর জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ এত বেশী করে ঐ বৈশিষ্ট্যটাকে টেনে এনেছেন যে কবির ব্যক্তিত্বটাকেই খর্ব করা হয়েছে তাতে। বোধহয় তারই প্রভাবে 'কবি সুকান্ত' বলে একটি নাটক রচিত হয়েছে এবং সেটা একটা নামকরা নাট্য-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সেই নাট্য-পত্রিকার একটা আদর্শ আছে এবং বিপ্লবই হলো সে আদর্শ। স্বভাবতই ঐ পত্রিকায় ঐ নাটকটি ছাপা উচিত হয়নি। নাটকটি আবার একাধিকবার মঞ্চে অভিনীতও হয়েছে।

সেই নাটকে কি দেখানো হয়েছে? দেখানো হয়েছে একটা দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন সুকান্তকে, যে সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত এবং 'হায়, আমি মারা যাব' বলে মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়ছে। সে সুকান্ত কেবলই কবিতা আওড়ায় এবং হতাশা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে।

বাঙলা দেশের একজন বিপ্লবী কবির এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। সুকান্তের দু'খানি জীবনীগ্রন্থ বেরিয়েছে, একখানি অশোক ভট্টাচার্যের, অপরখানি ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা। ঐ জীবনীগ্রন্থ দু'খানির কোথাও কিন্তু কবি সুকান্তের এই পরিচয় নেই। তাঁরা বলেছেন যে, সুকান্ত লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন, কিন্তু সে কোথায়? ব্যক্তিগত ব্যাপারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বা নিজের সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে তাঁর লজ্জা এবং সঙ্কোচের অবধি ছিল না, সে তো সুকান্তের সঙ্গে আমরা যারা মিশেছি সকলেই তা' জানি। তাতে সুকান্ত একটি দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র হয়ে পড়ল কি করে? ঐ জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যেই তাঁর অনেক দৃঢ় ব্যক্তিত্বসূচক ঘটনাবলীরও উল্লেখ আছে। আমি পরিণত সুকান্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং সেটা জীবনের শেষ পর্যায়ে, অনেকবার তাঁর এই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন আমিও হয়েছি। তিনি যেটা বিশ্বাস করতেন, যেটা সঠিক বলে বুঝতেন, সেখান থেকে তাঁকে একচুল নড়াবার ক্ষমতা কারো ছিল না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে লাজুকতার মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় কল্পনা করার অর্থ কি? এবং কেনই বা তা' করা হবে? ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সরল,

সুরসিক এবং দরদভরা হৃদয় নিয়ে সে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতো বটে—কখনো কখনো তাকে নিতান্ত নরম প্রকৃতির মানুষ বলেও মনে হতো কিন্তু প্রয়োজনে তার বলিষ্ঠ মনের পরিচয়ও পাওয়া যেত।"

সুকান্ত ভট্টাচার্য সলজ্জভাবে হেসে সুমিষ্টভাবে কথা বলতেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। 'স্বাধীনতা' অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁকে আমি মানিকবাবুর সঙ্গে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় তর্ক করতে দেখেছি, সেখানেও তিনি মিষ্টি হেসে কথা বলেছেন বটে কিন্তু তর্কে নিজের বিষয় থেকে সরে আসতে দেখিনি।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যুভয়ে কাতর সুকান্তকে আমি কখনো দেখিনি। সুকান্ত বিশ্বাস করতেন না যে তিনি মারা যাবেন। মাঠে-ময়দানে-রাস্তায় যেমন জনগণের মুক্তির জন্যে লড়াই করেছেন তেমনি নিজের রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন সমান মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে।

সুকান্তর এই ব্যক্তিত্বই তো তাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে। সে জন্যেই তো বিপ্লবের স্বপ্ন যারা দেখে তারা তাঁর কাব্য থেকে সংগ্রহ করে মনের খোরাক। খুব স্বল্পকাল-ব্যাপী জীবনের পরিধি হলেও এবং সৃষ্ট কাব্যের সংখ্যা সীমিত হলেও সুকান্তের লেখার স্টাইল সুকান্তেরই। বলা হয়, **style is the man,** অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্বই তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে style-এর জন্ম দেয়। সুকান্তের কাব্যের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, ব্যক্তিজীবনেও সুকান্ত সেই ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী ছিলেন। কাব্যে যিনি বলেছেন—

"... তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—"

ব্যক্তি জীবনেও আমরা এই সুকান্তকেই পেয়েছিলাম। প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল সরাতে সরাতেই তিনি বিদায় নিয়েছেন, হার মানেননি বা আত্মসমর্পণ করেননি। নিজে শেষ হয়ে গেছেন কিন্তু নিজের জন্যে কারো দ্বারস্থ হননি। এইখানে তিনি মুখচোরা, এইখানে তিনি লাজুক, এটা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও মহত্ত্ব দান করেছে, তাকে ছোট করেনি বা দুর্বল করেনি।

তাঁর ব্যক্তিত্বে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার বা চমক লাগাবার মতো কিছু ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, 'একদিন সে সকাল আসবেই' সেদিন 'পৃথিবী মুক্ত-জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী' হবে।

তাইতো তিনি যেখানে প্রার্থনা করেছেন সেখানেও সে প্রার্থনার মধ্যে দুর্বলতা নেই, নেই ভীরু কাতরতা। সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করলেও তিনি কল্পনা করেন, "একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!"

সুকান্তর ব্যক্তিত্বের কথা ভাবতে গেলেই আমার মনে পড়ে তাঁর কবিতার সেই লাইনগুলো—

"আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না :
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস ;"

কবির চেহারা, কবির কথাবার্তা, কবির আচরণের মধ্যে প্রথমে মনে হবে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, একেবারেই সাধারণ, একেবারেই নগণ্য। কিন্তু— 'তবু জেনো' সেই মানুষটার বুকেই 'উসখুস করছে বারুদ', রয়েছে তাঁর মধ্যে 'জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস'। এই উচ্ছ্বাসেই সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। এই উচ্ছ্বাসেই প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে রাস্তায় নেমে এসেছেন।

এই উচ্ছ্বাস যে কি রকম তার আর একটা স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না। সারা বিকেল এবং সন্ধ্যা আমি যখন তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকতাম তখন এই উচ্ছ্বাসেরই আর একটা দিক আমার নজরে পড়েছে। ল্যাংস্টন হিউজ-এর কবিতা **'Labour Storm'** নিয়ে গেছি সেদিন। কবিতাটা পড়ার পরই দেখলাম সেই 'দুরন্ত উচ্ছ্বাস'। কি আনন্দ কবির ঐ কবিতাটি পেয়ে। কে বলবে তিনি অসুস্থ, কে বলবে তিনি রোগে ভুগছেন! শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে এমন সুন্দর কবিতা, মুক্তির স্বপ্ন, বিপ্লবের স্বপ্ন, দেখেন যে কবি তাঁর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এমন কবিতা অনুবাদ না করে কি থাকা যায়!

সুকান্তের ব্যক্তিত্ব মধুর এবং কোমল, সে ব্যক্তিত্ব 'হাতছানি' দেয় বারে বারে এবং সে ব্যক্তিত্ব আরও অনেক কিছু আমাদের দিতে চেয়েছিল—

"ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥"

কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব শত্রুর প্রতি নির্মম, সে ব্যক্তিত্ব হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠতে জানে—

"লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো রক্তের ভাগীরথী আনো।"

সুকান্তর কাব্যে যে বক্তিত্বের প্রকাশ তার থেকে ব্যক্তি-সুকান্তকে আলাদা করা সম্ভব নয়, যাঁরা তাঁকে সঠিকভাবে পেতে চান তাঁরা যেন তাঁর কাব্যের মধ্যেই তাঁকে খোঁজ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যে প্রতিবিম্বিত।

সুকান্তর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যখন বলতে বসেছি তখন আর একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। সুকান্ত সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "হ্যাঁ, একই

সুকান্ত। কখনো বিষণ্ণ, কখনো আশায় উন্মুখ। কখনো আঘাতে কাতর, কখনো সাহসে দুর্জয়। কখনো চায় জনতা, কখনো নির্জনতা। কোথাও ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতেই পারে না, কোথাও ঘৃণায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।"

ব্যক্তিগতভাবে এই সুকান্তকে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। প্রধানত চিঠিপত্রগুলোর মধ্যে যে সুকান্তকে পাওয়া যায় তাকে নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কবি সুভাষ। প্রশ্ন করেছেন, "একি আমাদের সেই একই সুকান্ত? 'ছাড়পত্র' আর 'ঘুম নেই'-এর?" বিস্ময় প্রকাশ করলেও এই দুই সুকান্তের মধ্যে যে কোনো গরমিল নেই তা' তিনি মেনে নিয়েছেন বলেই ধরে নেব। বিষয়টাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা যাক। 'পূর্বাভাস' নাম দিয়ে সুকান্তর যে কবিতা-গুলোকে গ্রথিত করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু কবিতা আছে যেগুলো পড়লে বুঝতে পারা যায় সুকান্তর তখনো 'বিশ্ব-দর্শন' ঘটেনি। কবি তখনো জীবনের অভিজ্ঞান লাভ করেননি। নিজের চারপাশেই কেবল ঘুরে মরছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাটা উত্থাপন করা যেতে পারে। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'মানসী'-র বিষাদ-ক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ ছিলেন, বাইরের বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি বলে হতাশা এবং বেদনাই ছিল সেই পর্যায়ের রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর। ব্যক্তিজীবনেও রবি-কবি তখন বিষাদ-জ্বরে ভুগছেন।

'পূর্বাভাস'-এর ঐ কবিতাগুলোর মধ্যে সুকান্তর অবস্থাও তাই। সুকান্তের মনেও তখন বিষাদ আর বিষাদ—কবির পৃথিবী তখন নিঃস্পন্দ অসাড়! তাই—

"—এই কি পৃথিবী?
একদিন জ্বলেছিল বুকের জ্বালায়—
আজ তার শব দেহ নিঃস্পন্দ অসাড়॥"

কবির হৃদয় অবসাদে ক্লান্ত, কবি দিশাহারা, দাঁড়াবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন—

"তাইতো শক্তি হারিয়েছি আজ
দাঁড়াতে পারি না রুখে।"

পরবর্তী সময়ে যিনি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তাঁর কাছে যা নবীন, যা আগামী দিনের অঙ্কুর তাও এই সময় ব্যর্থতামণ্ডিত বলে মনে হচ্ছে। নবীনের থেকে পুরাতনই এই পর্যায়ে কবির কাছে বরণীয়। কবি তাই লিখছেন—

"এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভালো পুরনো, চাই না বৃথা নবীন।"

এই সুকান্তর কাছে জীবন তখন বলতে গেলে মূল্যহীন, পৃথিবীতে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে কবির কোনো দৃঢ় আস্থা নেই—

"জন্মের প্রথম কাল হতে
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।"

নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে কাটিয়ে মানুষকে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিতে দেখতে পাননি কবি তখনো, তাই জীবনের সূচনাতেই কবির চিন্তায় মৃত্যুর উপস্থিতি। কবির মনে বিষাদ চিন্তা গভীর ছাপ ফেলেছে—

"সন্ধ্যাবেলা, আজ সন্ধ্যাবেলা
নিষ্ঠুর তমিস্রা ঘনাল কি!
মরণ পশ্চাতে বুঝি ছিল
সহসা উদার চোখাচোখি॥"

এমন কি গভীর হতাশায় পৃথিবী থেকেও বিদায় চাইছেন কবি—

"হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল ক'রে
মনে রাখ মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার।"

এ পর্যন্ত যে সুকান্তর কথা বললাম সে সুকান্ত সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। এ সুকান্তর সৃষ্টিও আমাদের কাছে মূল্যহীন। ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন যদি তোলা যায় তবে এই সুকান্ত ব্যক্তিত্বহীন। নিজের চারপাশকে ছাড়িয়ে উঠে তিনি যেদিন মানব-জীবন এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসের চাবিকাঠিটির সন্ধান পেলেন সেদিন বিস্ফোরণ ঘটল, সেদিন নবজন্ম ঘটল কবি সুকান্তর। কবি বিষাদ জ্বরকে সবলে দু'হাতে সরিয়ে এগিয়ে এলেন —যে মানুষ ইতিহাস গড়ছে সেই মানুষের মধ্যে। এখন আর "নতুন মুহূর্ত আর এক/সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ।' বলে মুহূর্তকে চিহ্নিত করা নয়; এখন আর 'মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।' —এই ধরনের হতাশা-ব্যঞ্জক কথা বলে কবিতার শেষ পংক্তি টানা নয়,এখন কবির চোখে—

"হাজার জীবন বিকসিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।"

এখন কবি সারা পৃথিবীকে দু'চোখ মেলে দেখে নিয়ে মানুষের কাছে ঐতিহাসিক কর্তব্যের আহ্বান তুলে ধরেন—

"তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি।
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের 'মরণ-যজ্ঞ' চলে নিত্য;
পণ কর, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলব সবাই এক সঙ্গে;"

হতাশা কি নেই? ব্যর্থতা কি নেই? কিন্তু কবির মন বিরাট আশ্বাসে ভরে উঠেছে, দুর্ভিক্ষ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছেন তিনি। কবি দেখতে পেয়েছেন—

"হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাঙলা দেশের প্রাণ।"

এই স্বপ্ন ছিল না বলেই কবি বিষাদ জ্বরে ভুগছিলেন, কবির সামনে করণীয়ও কিছু ছিল না। কিন্তু এখন অনেক কিছু করার আছে, কবির দায়িত্ব এখন অনেক, ফ্যাসিষ্ট শক্তি ভারতবর্ষের দোর গোড়ায়, দেশবাসীকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—

"বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত।
বাঙলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত॥"

কবি সুকান্ত এবং ব্যক্তি সুকান্তর ব্যক্তিত্বের জন্ম এইভাবেই হয়েছিল। এখন থেকে কোনো ব্যাপারে আর মাথা নোয়ানো নয়, প্রতিটি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত। হতাশার স্থান নেই আর। মাথা নিচু করে থাকা বিন্ধ্যাচলকে তিনি মাথা তুলতে বলছেন। ধূর্ত চতুর অগস্ত্যের দ্বারা সে প্রতারিত হয়েছে। আর গুরুভক্তির প্রয়োজন নেই, গুরুকে এবার সে চিনে নিক—

"তুমি প্রতারিত বিন্ধ্যাচল,
বোঝনি ধূর্ত চতুর ছল,
হাসে যে আকাশচারীর দল
অনাহত।"

আকাশে দেবতারা হাসছে কারণ বিন্ধ্যাচলের পৌরুষকে তারা খর্ব করতে পেরেছে, বিন্ধ্যাচলের মাথা তারা নোয়াতে পেরেছে। কিন্তু কিভাবে? ধূর্ত গুরুর প্রতারণায়। সরল বিশ্বাসী বিন্ধ্যাচল কি সেই থেকে মাথা নত করে থেকে নিজের শৌর্য-বীর্য-বল সব হারিয়ে ফেলেছে? হতে পারে, অসম্ভব কি? বৃটিশের অধিকারে দুশো বছরের পদানত ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থাও কি তাই? তারাও কি নিজেদের বল-বীর্য হারিয়ে ফেলেছে?

"শোন অবনত বিন্ধ্যাচল,
তুমি নও ভীরু বিগত বল
কাঁপে অবাধ্য হৃদয়দল
অবিরত।
কঠিন, কঠোর, বিন্ধ্যাচল,
অনেক ধৈর্যে আজো অটল

ভাঙো বিষ্মকে : করো শিকল
পদাহত।"

বিদ্রোহী কবি সুকান্তর বিদ্রোহের শুরু এইখান থেকে। রাজনীতিতে দীক্ষা মার্কস্‌বাদে দীক্ষা এবং সেই দীক্ষার মধ্যে দিয়েই এই বিদ্রোহের জন্ম, এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই তৈরী হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব।

"সময় যে হল বিন্ধ্যাচল,
ছেঁড় আকাশের উঁচু ত্রিপল
দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল
শত শত॥"

আমার বক্তব্যটা এবার আর একটু পরিষ্কার করে বলি। সুকান্তর এই ব্যক্তিত্ব কথায় কথায় হতাশায় ভেঙে পড়বার মতো ছিল না। কারণ এই ব্যক্তিত্বের পেছনে ছিল একটা দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসটা যদি ঠুন্‌কো হতো, তা'হলে অন্য কথা ছিল। এই ব্যক্তিত্ব চরম ব্যর্থতার মধ্যেও চূড়ান্ত সংগ্রামে বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল। কাজেই হতাশার স্থান নেই সেখানে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কখন কি কারণে মনে আঘাত পেলেন, চিঠিতে সেই মুহূর্তে কার কাছে কি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, সেটা দিয়ে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর যে মূল অবস্থান তার স্খলন হয় না। রক্তমাংসের মানুষ যখন তখন ব্যক্তিগতভাবে ব্যথাবোধ, দ্বিধা-সঙ্কোচ, মনে কোনো কিছুতে আঘাত লাগবার ঘটনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলির অস্তিত্ব উড়িয়ে দেবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তাতে সুকান্তর যে ব্যক্তিস্বরূপ তা' খর্ব হয়ে যায় কোন্ যুক্তিতে?

সুকান্তর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সারা দেশের সত্তা যখন এক হয়ে গেছে, সারা দেশের ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে ব্যক্তি সুকান্ত যখন আর পৃথক নয় তখন হতাশায় মুষড়ে পড়া সুকান্তর কল্পনা আসে কোথা থেকে?

"অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত চতুর্দিক,
আজো বেঁচে আছি, মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।"

এই দুটি পংক্তি তো সুকান্তর লেখা, না-কি? এই উক্তিটা কি একেবারেই কথার কথা? এর সঙ্গে কি সুকান্তর অন্তরের যোগ নেই? অন্তরের যোগ যে আছে তার প্রমাণ পরের দুটি পংক্তি—

"দুলে ওঠে দিন : শপথমুখর কিষাণশ্রমিক পাড়া,
হাজারে হাজারে মাঠে বন্দরে আজকে দিয়েছে সাড়া।"

এই হাজার হাজার কিষাণ-শ্রমিক জাগরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, তাদের আন্দোলনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সব কিছুরই অংশীদার তিনি, কাজেই এখানে হতাশার স্থান নেই। কবির চোখে বিজয়ের স্বপ্ন, মনে দুরন্ত সাহস, সংগ্রামী মানুষের উপরে অসীম আস্থা।

"জলে আলো আজ, আমাদের হাড়ে জমা হয় বিদ্যুৎ,
নিহত দিনের দীর্ঘ শাখায় ফোটে বসন্তদূত।"

সুকান্ত এখানে ভারত ইতিহাসের এবং ভারতের ভাগ্য গড়ার সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ জনগণের একজন হয়ে গেছেন। ভারতের জনগণের সংহত-একতাবদ্ধ রূপই তো ভারতের ইতিহাস রচনা করবে—

"মূঢ় ইতিহাস ; চল্লিশ কোটি সৈন্যের সেনাপতি !
সংহত দিন, রুখবে কে এই একত্রীভূত গতি ?"

সুকান্তর অনুভূতি অতীতকে ঝেড়ে ফেলে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, যেখানে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে তিনি একা নন, চল্লিশ কোটি সৈন্যের তিনি একজন। একাকীত্বের মধ্যেই রয়েছে হতাশা, দ্বিধা, বেদনায় ভেঙে পড়ার ভয়। সুকান্ত এই সময় ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় একজন সচেতন অংশীদার। সারা দেশ তখন নতুন ইতিহাস রচনায় কদম বাড়িয়েছে—

"হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,"

এবং সেই উচ্ছ্বাস কবিকেও উদ্বেল করে, সংগ্রামের ময়দানে নতুন করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়। সুকান্ত মারা গেছেন কিন্তু কখনো পরাজিত হননি বা হার মানেননি। তাঁর অটল বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরেনি এবং সে জন্যেই ব্যক্তি জীবনেও আমরা কখনো হতাশায় ভেঙে পড়া সুকান্তকে দেখিনি। চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভবিষ্যতের প্রতি পূর্ণ আস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন তিনি। সারা দেশের বুকে যখন প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পঙ্কিল আবর্তে বিপর্যস্ত তখন সেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্ত-পঙ্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি লিখছেন—

"এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে।"

কবির এই বিশ্বাসের উৎস কোথায়? কবির হৃদয়, এবং এটা অস্বীকার করা যায় কোন্ যুক্তিতে? ব্যক্তি জীবনে তাঁর যে বিশ্বাস তাই তো কাব্যে মূর্ত হয়েছে। তা'হলে ব্যক্তি জীবনে সেই লোকটি ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল এবং হতাশাগ্রস্ত হয় কি করে?

ব্যক্তি সুকান্তকে তাঁর সৃষ্ট কাব্যকে বাদ দিয়ে কেউ যেন বিচার করার চেষ্টা না করেন। এমন কি কেবল মাত্র তাঁর চিঠিপত্রের ওপর ভিত্তি করে যেন তাঁর ব্যক্তিরূপকে খাড়া করার চেষ্টা করা না হয়। আবারও সেই কথা বলতে হচ্ছে যে, সুকান্তর সৃষ্টি এবং ব্যক্তি সুকান্ত পরস্পর অচ্ছেদ্য।

চিঠিপত্র সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ

থেকে যাবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই মনোভাব ধারণ করে আছে একখানি মাত্র চিঠি এবং সে চিঠি কোনো বন্ধু-বান্ধবকে লেখা নয় —সরলা বসুকে লেখা। চিঠিটার কোনো তারিখ নেই, কাজেই কবি, কোন্ প্রসঙ্গে এবং কি অবস্থায় চিঠিটা লিখেছিলেন তা' জানবার উপায় নেই। চিঠিটা পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় কবির মনে বেদনা এবং বিক্ষোভের কিছু কারণ ঘটেছিল। ঐ চিঠিরই আর একটা জায়গা উদ্ধৃত করছি বিশেষ কারণে—

"...যেখানে যাই, সেখানেই দেখি কুশ্রীতা মলিনতা —এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এত কথা বলছি এর কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আশ্বাস চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি।..."

ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে সুকান্তর ঐ বয়সে কখনো এ রকম মুহূর্ত আসতে পারে যখন মনটা বেদনা-বিদ্ধ হয়, বিশেষ করে একান্ত আপন বা নিজস্ব বিশ্বাস বা ভিত্তির স্থান থেকে কখনো কোনো আঘাত এলে। ঐ চিঠিতেই সুকান্ত তাই প্রশ্ন করেছেন এবং সরলা বসুর কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, "আচ্ছা, এই মনোভাব কি সবার মধ্যেই আসে এক বিশিষ্ট সময়ে?"

কবি সরলা দেবীর কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়েছেন, "যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি।"

এই চিঠিটিই যদি দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন সুকান্ত চরিত্র সৃষ্টির মূলধন হয়ে থাকে তবে বলব, এত বড় অবিচার যারা সুকান্তর ওপর করতে পারেন তাঁরা যেন দয়া করে সুকান্তর নাম মুখে না আনেন।

সুকান্ত তাঁর একান্ত প্রিয় স্থান থেকে আঘাত পেয়েছিলেন এবং সে আঘাতের বেদনা অরুণাচলকে লেখা একটা চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন—

"আমার খবর: শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময় (ভয় নেই, আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল চারদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালো-মতো। একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও" ঘটেনি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিন মাস ধরে খাটছি। বুঝতে পারিনি স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম। একটু দাঁড়াতে পেরেই গত দেড় মাস ধরে...... ...জন্যে অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে...কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে

পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা! আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের "ওষুধপথ্যিহীন" কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হই নি। আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে! দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহে আর মনে আমি দুর্বল: একান্ত অসহায় আমি? আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল। কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের; একখানাও জামা নেই, সে জন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অর্থের অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।"

এই চিঠিটার এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম এই কারণে যে, এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। সুকান্ত তাঁর ব্যক্তিজীবনে অভাবের কথা বলেছেন সেই সঙ্গে বলেছেন এমন একটা জায়গা থেকে আঘাত এবং বঞ্চনার কথা যা' তাঁর কবিসত্তাকে আঘাত দিয়েছে দারুণভাবে। চিঠির উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সুকান্তর অভিমান। আমার প্রশ্ন, এই অভিমান কি একা সুকান্তর? এবং এই অভিমানের হাত থেকে কি লেখক-শিল্পীরা আজও মুক্তি পেয়েছেন? পেয়েছেন যথাযোগ্য মর্যাদা এবং মূল্য? ঠিক সুকান্তর মতোই তাদের মধ্যে আজও লেখকসত্তা এবং কর্মীসত্তার দ্বন্দ্ব আছে এবং কর্মীসত্তা বার বার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

সুকান্তর মৃত্যুর পরে তেত্রিশ বছরেও এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি! আমি কিন্তু চিঠির এই অংশের মধ্যে হতাশায় ভেঙে পড়া সুকান্তকে দেখছি না, দেখছি সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সুকান্তকেই, দেখছি একটা অবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদকেই। এই সুকান্তর সঙ্গে 'ছাড়পত্রের' সুকান্তকে মেলাতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সুকান্ত এবং তাঁর ঠিকানা

সুকান্তর কথা আজ যখন স্মরণ করতে যাই তখন কয়েকটা বিষয় বিশেষ করে মনে আসে। তাঁকে দেখে মোটেই কবি বলে মনে হতো না, চেহারায় তো নয়ই (যদি ঢোলা পাজামা, হাঁটুর নিচে ঝুল পাঞ্জাবি, ঝাঁকড়া ফাঁপানো অবিন্যস্ত চুল, কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনী ব্যাগ কবি চেহারার নিদর্শন বলে ধরে নিই তা'হলে একেবারেই নয়), এমন কি কথাবার্তায়ও তিনি ছিলেন সাধারণ জগতের লোক, পুরোপুরি রাজনৈতিক জগতের মানুষ। তবে সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না, উৎসাহেরও সীমা ছিল না। সুকান্ত খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা ছিলেন, হয়ত অনেকক্ষণ ধরে আমি আমার .কথা বলে যাচ্ছি, শুনছেন কি শুনছেন না বুঝতে পারছি না কারণ তাঁর দিক থেকে কোনো রকম সাড়াই নেই, এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দারুণ উৎসাহ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যটা বোঝাতে শুরু করে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের অনেক কথা আমার আজ মনে পড়ে। অতীতের স্মৃতি মনে করতে গিয়ে অনেকেই দেখে থাকবেন যে, অতি তুচ্ছ কোনো ঘটনা, যা' শুনলে হয়ত লোকে হাসবে এমন সাধারণ ব্যাপারও বড় অনেক কিছুকে ছাপিয়ে মনের কোণে স্থান জুড়ে থাকে। তেমনি সুকান্তর কথা ভাবতে গেলে একটা দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ চোখের সামনে দেখতে পাই। নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে সুকান্ত তখন একেবারে শয্যাশায়ী, বিকেল চারটের পর সুকান্তর বৌদি (সুশীলদার স্ত্রী) একটা করে ডিমের পোচ্ সুকান্তর ঘরের টেবিলে দিয়ে যেতেন, বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সুকান্ত উঠে খেয়ে নিতেন। আমি প্রায় রোজই তাঁর ওখানে যেতাম এবং এই ঘটনার কোনো ব্যতিক্রম হতো না। আমি কোনো বইপত্র কি সুকান্তর কোনো লেখার মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করতাম (এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই) এবং সুকান্ত সেই ফাঁকে সলজ্জ-ভাবে ডিমটা খেয়ে নিতেন। এই ঘটনাটা কেন এত বিশেষভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমি তা' বলতে পারব না। হয়ত সুকান্তর শরীর সারাবার সেটা একটা বৃথা চেষ্টা ছিল বলেই হবে। তখনো পর্যন্ত তাঁর রোগ নির্ণয় হয়নি, ভেতরে যে টি. বি. রোগের বীজাণু প্রতি মুহূর্তে তাঁকে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে তা'

তখনো কেউ জানেই না। ঐ ডিম সেই মারাত্মক শত্রুর সঙ্গে কি করে পেরে উঠবে! এই কথা ভেবেই হয়ত সেই ঘটনার কথা আমি ভুলতে পারি না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের এককালে খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিল। সে স্বাস্থ্য আমি দেখিনি। কিন্তু রোগা সুকান্ত বা ভেঙে-পড়া স্বাস্থ্যের অধিকারী সুকান্ত যেভাবে হাঁটতেন তা' আজকে ভাবলে অবাক লাগে। সুকান্তর মৃত্যুর কারণ তাঁর সংসারের দারিদ্র্য নয়। নিজের শরীরের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত অবহেলাই তাঁর জীবনের দিনগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। সুকান্ত যখন প্রকৃতই সুস্থ ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন তখন তিনি যে কখন কোথায় আছেন তার খোঁজ কারো পক্ষে জানাই সম্ভব ছিল না। সুকান্ত হয়ত নিজেও জানতেন না তিনি কখন কোথায় থাকবেন। 'ঠিকানা' কবিতায় তিনি যে লিখেছেন, 'ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু —/ঠিকানার সন্ধান,/আজও পাওনি ?' —বাস্তব জগতে তাঁর এই ঠিকানার সন্ধান তিনি নিজেও জানতেন না। কেবল একটা ঠিকানাকে সামনে রেখেই তিনি পথে পথে হেঁটে বেড়িয়েছেন। আসলে সেই ঠিকানাটাই তিনি দিয়েছেন তাঁর 'ঠিকানা' কবিতায়। এ ব্যাপারে কবির সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি যে বলেছেন, 'ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু/পথে পথে বাস করি', —কথাটা খুবই যথার্থ। পথটাকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এহো বাহ্য। তাঁর ঠিকানা একটি জায়গায় ছিল নির্দিষ্ট, সে হলো, 'জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু/সে পথে আমাকে পাবে'। জালালাবাদের পথ ধরে এসে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আর একটি তীর্থক্ষেত্র ধর্মতলা স্ট্রীটের রক্ত-লেখার মধ্যে রয়েছে সেই ঠিকানা। কাজেই সুকান্তর ঠিকানা হচ্ছে c/o. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম। তাই তো তাঁর ঠিকানা পেতে হলে সেই পথে যেতে হবে যে পথ 'মন্বন্তর থেকে/ঘুরে গিয়েছে' ...এবং কিছু দূরে গিয়ে মুক্তির পথে বাঁক নিয়েছে।

কিন্তু সেই ঠিকানা শেষ পর্যন্ত গিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে স্থান নিয়েছে রুশ এবং চীন বিপ্লবের মধ্যে। ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের মধ্যেও সেই বিপ্লবের আগুনই তখন দেখতে পেয়েছিলেন কবি—

"ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।"

ব্যক্তিগত জীবনে যে কবির নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ছিল না সেই কবির ঠিকানা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুকান্তর কর্মক্ষেত্র ছিল রাজনৈতিক জগৎ। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী জীবন পরিধির মধ্যে দেশের বুকের ওপর দিয়ে অনেক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি কি ছিলেন, কেমন ছিলেন সে আলোচনা অনেক হয়েছে। সব কিছু সম্পর্কে সকলে যে একমত হবেন এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কাব্য আলোচনা কালে বিকৃতিকে রোধ করবার দায়িত্ব আছে আমাদের সকলের।

নানা দিক থেকে তাঁর কাব্য-ভাবনাকে বিকৃত করবার যে একটা সচেতন প্রচেষ্টা আছে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা ভালো। মনে রাখতে হবে, সুকান্ত যে বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে নিজেকেই লেনিন বলে অনুভব করেছিলেন সেই বিপ্লব কিন্তু আজও সুদূর স্বপ্নই রয়ে গেছে। সেই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবার গুরুদায়িত্ব রয়েছে আমাদের ওপর। ভারতবর্ষের বুকে বিপ্লবকে আসন্ন করে আমরা যেন রূপান্তরিত হতে পারি এক একটা আগ্নেয়গিরিতে, হতে পারি ভিসুভিয়াস, ফুজিয়ামার জাগ্রত বংশধর, আর আমাদের দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি।

আজ এই সব কথা বলতে হচ্ছে এই জন্যে যে, সেদিন আমরা যারা বিপ্লবী মঞ্চে জড়ো হয়েছিলাম, আমরা যে পতাকার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে ভ্রাতৃত্ববন্ধন। সুকান্ত যে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন সেই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে এই সৃষ্টি সম্ভব হতো না। বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা এবং মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসকে আশ্রয় করে যে শিল্প তাই সমাজকে পথ দেখাতে পারে। সুকান্তর কাব্য আলোচনার সার্থকতা হচ্ছে সেখানে। আমি শিল্পীর সততার প্রশ্ন তুলছি এখানে, তাঁর বিশ্বাসের সততা। এই প্রশ্ন আমি বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়েই তুলছি। সুকান্ত যেদিন বলেছিলেন—

"দেখ চেয়ে অরাজক রাজ্য ;
ধ্বংস সমুখে কাঁপে নিত্য
এখনো বিপদ অগ্রাহ্য ?"

সেদিনের ভারতবর্ষ একটা ক্রান্তিকালে এসে পৌঁছেছিল। এই ক্রান্তিকালের কবির জন্যে প্রয়োজন ছিল দুর্দমনীয় সাহস, সততা এবং বিপ্লবের জন্যে নিঃস্বার্থ আত্মদান। বর্তমানে আমরা আর একটি ক্রান্তিকালের দরজায় এসে পৌঁছেছি। 'এ পুরাতন পৃথিবী দেখ আজ অবশেষে নিঃস্ব' —এই উক্তি তখনকার সুকান্তর না হয়ে বর্তমানের কোনো কবির কাব্যে কি কালানুগ হতো না? হতো, এবং নিঃস্ব ভারতবর্ষের বুকে আজও আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সুকান্তর মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পরেও। কিন্তু আজ আমাদের বুকে বিপ্লবের স্পন্দন অনুভব করছি না কেন, যে স্পন্দন সুকান্ত অনুভব করেছিলেন? কারণটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। ভারতবর্ষের বুকে জনগণের শিবির, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের শিবির এখনো দুর্বল, এখনো সেভাবে সংগঠিত নয়। যে আত্মত্যাগ এবং যে বিশ্বাসকে আশ্রয় করলে

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের শিবির সংগঠিত হয় আজকের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তার অভাব রয়েছে বললে কি ভুল বলা হয়? সাহিত্যকে যাঁরা রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিয়ে যেতে চান সে দলে সুকান্ত ছিলেন না। সুকান্তর এমন অনেক কবিতা আছে যা' তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর রচিত, ঐ আন্দোলনের ঢেউয়ের ওপর পতাকার মতো উড়ছে কবিতাগুলি। আজ বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাটা উল্টো দিকে প্রবাহিত। দুর্বোধ্য মানসিকতাকে আমদানি করে, দেশের মানুষের প্রতিটি সংগ্রামের দিকে পেছন ফিরে কবিতাকে জনজীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার যে চেষ্টা সেটাকেই 'আর্ট' বা শিল্প করে তোলা হয়েছে। সুকান্তর ঠিকানা ছিল c/o. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম। কিন্তু এই সব কবিদের ঠিকানা এখন বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর দাস-শিবির এবং সুকান্তর লক্ষ্য যেখানে ছিল বিপ্লব, সেখানে এই কবিদের লক্ষ্য মুদ্রা এবং মিথ্যা খেতাব। এদের যে মূল্য প্রাপ্য বাঙলাদেশের মানুষ সেই মূল্যেই যে এদের একদিন নগদ বিদায় দেবে এ বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই।

সুকান্তকে নিয়ে মিথ্যাচার

১৯৭২ সালে কোনো এক বন্ধুর বিয়েতে দেখেছিলাম নিমন্ত্রিতেরা যে বইগুলো উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে 'সুকান্ত বিচিত্রা' বলে একখানা খুব মোটা বই। বইখানাতে বহু লেখকের স্মৃতিকথা সঙ্কলিত হয়েছে। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম বইটি, কিন্তু পড়বার কোনো আগ্রহ মনে জাগেনি। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বাঙলাদেশ থেকে 'সুকান্ত পরিচয়' আমার হাতে এল। ঐ বই-এর কিছু কিছু লেখার ওপর দিয়ে চোখ বুলোতে গিয়ে নজরে পড়ল প্রাণতোষ ঘটকের লেখা 'সুকান্ত স্মরণে'। ঐ লেখাটি পূর্বে দেখা সেই 'সুকান্ত বিচিত্রা'তেও ছিল। 'চারাগাছ' কবিতাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে দেখে লেখাটি পড়বার কৌতূহল জাগল, কিন্তু পড়তে গিয়ে চমকে উঠলাম। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুদূর পড়েই হতভম্ব হয়ে গেছি, তখনো বুঝতে পারিনি লেখাটির মধ্যে আরও কি বিস্ময় লুকিয়ে আছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলাচ্ছিলাম 'চারাগাছ' কবিতাটি নিয়ে। স্মৃতিকথাটির মধ্যে যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই মিথ্যাচার তখনো অতটা ভাবতে পারিনি। ঐ কবিতাটি 'বসুমতী'তে ছাপা হওয়া এবং তার পারিশ্রমিক নিয়ে আসা সম্পর্কিত তথ্যটি আমি 'সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, কাজেই সে তথ্য এখানে আর পুনরুল্লেখ করছি না। যেহেতু ঘটনাটির সঙ্গে আমি জড়িত কাজেই স্মৃতিকথার নামে এই নির্ভেজাল মিথ্যাচার আমার নজরে পড়ল। এই ধরনের কত মিথ্যাচার হয়ত আরও নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে যেগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু ধরতে পারবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সব কিছু পড়াও তো সম্ভব নয়, সে'জন্যে অনেক কিছুই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যাবে। সুকান্তর স্মৃতিচারণে এইরকম কোনো ব্যাপারের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, কাজেই একটা জোর ধাক্কা খেলাম। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে গোটা প্রবন্ধটা ধৈর্য ধরে পড়তে গিয়ে দেখলাম লেখকের কল্পনার বিস্তার অসাধারণ। লেখাটিকে প্রবন্ধ না বলে কাব্য বলাই হয়ত উচিত হবে, কিন্তু বলতেই হবে যে, এই কবি-কল্পনা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

প্রাণতোষবাবু লিখেছেন, "কিছুদিন দেখা না পেলে অদর্শনের ব্যথা বাজে মনে।" ভাষাটা পুরোপুরি কাব্যের ভাষা। কিন্তু এই অদর্শনের ব্যথা প্রাণতোষবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না, ব্যথা উপশমের জন্যে তিনি একেবারে সুকান্তর বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। সুকান্ত যে তাঁর হৃদয়ের এতখানি দখল করে বসেছিল সে কথা কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা কেউই জানতাম না। 'কিছুদিন' কথাটার অর্থ কি ? তা'হলে কি শয্যাশায়ী সুকান্ত আমাদের অজান্তেই গোপনে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসতেন ?

তিনি লিখছেন, "কলকাতায় শহরতলীতে সুকান্তদের বাসায় গিয়ে হাজির হই। লেখা কই ? তুমি কই ? অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবুডুবু বেলেঘাটা অঞ্চল। গাড়ি যাওয়ার পথ নেই আর। জলে জলময়, যেন এক বন্যাঞ্চল। হাঁটু-ভর্তি নোংরা জলে পথ-ঘাট নালা-নর্দমা থৈ-থৈ।"

প্রবন্ধ পাঠককে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে, সুকান্ত মারা গেছেন বৈশাখ মাসে এবং "অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবুডুবু বেলেঘাটায়" প্রাণতোষবাবু হাজির হয়েছেন।

কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে অপূর্ব প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং "লেখা কই ? তুমি কই ?"—এর মধ্যে যে অসাধারণ কবিত্ব তা' আমাদের মুগ্ধ করে। এইবার আসল কথায় আসা যাক। ধরুন, লেখাটি পড়বার আগে যদি কোনো পাঠকের এই তথ্য জানা থাকে যে প্রাণতোষবাবু 'অদর্শনের ব্যথা' দূর করবার জন্যে কোনো দিনই সুকান্তদের বাড়িতে যাননি অর্থাৎ তাঁর এই স্মৃতিকথা জাতীয় বিবৃতিটি জলজ্যান্ত মিথ্যা, তা'হলে ঐ স্মৃতিকথা পড়তে গিয়ে সেই পাঠকের অবস্থা কি হতে পারে একবার ভাবুন। সেই পাঠক স্বভাবতই 'সুকান্ত বিচিত্রা' এবং 'সুকান্ত পরিচয়' বই দুটির পাতার দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে যাবেন এবং গালে হাত দিয়ে ভাববেন, লোকটা কি বলছে ? স্বভাবতই প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে তাঁর অনেক সময় লেগে যাবে। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অবস্থার শিকার।

প্রাণতোষবাবু কোনোদিন সুকান্তদের বাড়িতে যাননি। তবে সুকান্তর মৃত্যুর পরে এক ভরা বর্ষার দিনে তিনি নারকেলডাঙ্গা মেন রোড দিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। সেই সময় জলের মধ্যে তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তিনি জলবন্দী হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে সুকান্তর কোনো এক ভাই যাচ্ছিল। প্রাণতোষবাবু তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা বলতে পার, সুকান্তর ভায়েদের বাসাটা এখানে কোথায় ?' সে তাদের বাসাটা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল। এই হলো প্রাণতোষবাবুর সুকান্তদের বাড়িতে যাওয়া সম্পর্কে আসল তথ্য।

এইবার অবস্থাটা বুঝুন ! ঐ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সুকান্তকে নিয়ে তাঁর ঐ রকম একখানা স্মৃতিকথা লেখা হয়ে গেলো। হাঁটু-ডোবা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে

সুকান্তর ভায়েদের বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস করা, কারণ সুকান্ত তখন আর বেঁচে নেই, এবং সুকান্তর কোনো এক ভাই কর্তৃকই সেই বাড়ির অবস্থান নির্দেশিত হওয়াই পরবর্তীকালে স্মৃতিকথায় পরিণত হলো, "…সুকান্তদের বাসায় গিয়ে হাজির হই। লেখা কই? তুমি কই?" ছাত্রজীবনে আমাদের মধ্যে 'গুল্'-এর একটা সংজ্ঞা চালু ছিল। সে সংজ্ঞাটা হলো এই: 'সত্যকে কেন্দ্র করিয়া মিথ্যার ব্যাসার্ধ লইয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয় তাহাকে বলে গুল।' সেই সংজ্ঞার যে এমন সার্থক প্রয়োগ সম্ভব তা' এর আগে কোনাদিন চোখে পড়েনি। অথবা এক্ষেত্রে সে সংজ্ঞাও হয়ত ঠিক প্রযোজ্য হচ্ছে না। এর উৎকর্ষ তার থেকে শতগুণ বেশী। যাইহোক এই ঘটনার সঙ্গে কোনো পাঠক যদি প্রাণতোষবাবুর লেখা থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশকে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করেন তবে স্মৃতিচারণার নামে বাজারে কি জিনিস চলছে তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পেয়ে যাবেন।

এর পর আসুন প্রাণতোষবাবুর প্রবন্ধের বাকী অংশটা পর্যালোচনা করে দেখি। প্রাণতোষবাবু লিখছেন, "…কথা শেষ করে না সুকান্ত। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় আমাকে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা সস্নেহে বললেন —বৃষ্টি-জল ভেঙে এসেছো, একটু চা খাও বাছা।"

কে এই বর্ষীয়সী মহিলা? সুকান্তদের বাড়িতে তখন তো কোনো বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন না! প্রাণতোষবাবু লিখছেন, "সুকান্ত বলল, ইনি লেখিকা সরলা বসু। কবি অরুণাচলের মা।"

এরপর আরম্ভ হয়ে গেলো প্রাণতোষ ঘটকের কবি প্রতিভার আত্মপ্রকাশ:

"মা, যেন সর্বকালের তিনি। …তিনি আবার বললেন —শুধু চা খেও না, মিষ্টিমুখ কর একটু।"

"রেকাবীতে দু'টি সন্দেশ। একটি নিজে খেলাম। অন্যটি সুকান্তর হাতে ধরিয়ে দিলাম। সে কী লজ্জা তার। প্রচুর হাসল সে। নিষ্পাপ সরল হাসি। একটা সন্দেশ খাবে, তাও কত সঙ্কোচ।"

শয্যাশায়ী সুকান্ত উঠে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছে, ঘটনাটা ভাবতেও ভালো লাগছে, সুকান্তর কাছ থেকে তো এই রকম লৌকিকতাই কাম্য। কিন্তু সুকান্তর বৌদি, যিনি তখন ও বাড়ির গৃহকর্ত্রী এবং সব সময় সুকান্তকে দেখাশুনা করেন, তিনি কোথায় গেলেন? তিনি কি অতিথি সৎকারে অপারগ ছিলেন? বরং সুকান্তর মুখে তো উল্টোটাই শুনেছি। বিয়ে হয়ে এসেই একটা ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল ছন্নছাড়া সংসারের সমস্ত গুরুভার যিনি এত দক্ষতার সাথে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে অতিথি সৎকার করানো গেলো না? অরুণাচলের মা সরলাদেবী এসে ঐ সময় ঐ বাড়ির কর্তৃত্ব করছেন এবং অতিথি সেবার দায়িত্ব নিয়েছেন এইরকম ঘটনা ভাবতে গিয়ে তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমরা বাস্তব জগতের লোক, কল্পনার সীমা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক না হতে পারে!

বিপ্লবী কবির স্মৃতিকথায় এরপর প্রাণতোষবাবুর কলম একেবারে বৈপ্লবিক মোড় নিয়েছে।

তিনি সুকান্তকে জিজ্ঞেস করছেন, "কবে যাবে তুমি?"

সুকান্ত বলছেন, "আপনি বলুন কবে যাব।"

প্রাণতোষবাবু: "হেমেন্দ্রকুমার রায় তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। ···একটা ডেট দাও, হেমেনদাকে খবর দেব। তিনি আসবেন বসুমতীতে।"

সুকান্ত: "সামনের সোমবার যদি যাই?"

প্রাণতোষবাবু: "অসুবিধা হবে না। হেমেনদা বলতে গেলে প্রায় প্রত্যহই আসেন।"

সুকান্ত: "শুনেছি উনি শিশিরকুমার ভাদুড়ির খুব বন্ধু।"

প্রাণতোষবাবু: "হ্যাঁ, এক গেলাসের বন্ধু যাকে বলে।"

পরের লাইনে প্রাণতোষবাবুর মন্তব্য: "ভাগ্য ভালো যে সরলাদেবী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।"

এর পর: "আবার হাসল সুকান্ত। বিরাট একটা রসিকতা শুনেছে সে যেন।"

—বিপ্লবটা কোথায় এবার দেখুন। 'চারাগাছ' পকেটে রেখে প্রাণতোষবাবু বললেন, "তা' হলে সুকান্ত, ঐ কথা রইল। সামনের সোমবার তুমি আসছ।"

সুকান্ত: "হেমেন্দ্রকুমার কখন আসবেন?"

প্রাণতোষবাবু: "উনি সাধারণত দুপুরের দিকেই আসেন।"

সুকান্ত: "আমিও যাব ঐ সময়।"

যে সুকান্ত সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী তিনি 'বসুমতী' অফিসে যাবার জন্যে ডেট দিচ্ছেন। কল্পনায় না-কি খোঁড়াকে দিয়েও পর্বত লঙ্ঘন করানো যায়, আর এ তো শয্যাশায়ী ব্যক্তির নারকেলডাঙ্গা থেকে বৌবাজার স্ট্রীটে যাওয়া!

তারপর ঘটনা কোথায় গড়ালো? প্রাণতোষবাবু লিখছেন,

"সেদিন সে এসেছিল মধ্যাহ্নবেলায়।"

রীতিমতো একটি কবিতার চরণ নয় কি? সুকান্ত মধ্যাহ্নবেলায় 'বসুমতী' অফিসে এসেছিল মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে (প্রাণতোষবাবুর স্মৃতিচারণ অনুসারে)। এই ঘটনাটি গদ্যে লেখা সম্ভব নয়। তাই তো কাব্যের প্রয়োজন। সুকান্ত এসে কি বলেছিল? বলেছিল,

"···যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে বেড পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হব। এখন থেকে চিঠি, পত্রিকা, টাকাকড়ি সবই ওখানে পাঠাবেন। ভর্তি হয়ে চিঠি দেব বেড নম্বর জানিয়ে।"

বুঝুন এবার কল্পনার দৌড়। এর পরেও আর কিছু বলার থাকে কি? এবারের কল্পনা দেখছি মহাকবির কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। প্রাণতোষবাবুর স্মৃতিচারণার

সময়টা শ্রাবণমাস এবং বর্ষাকাল কিন্তু সুকান্ত টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন চৈত্রের শেষে। তা' ছাড়া হাসপাতালে বেড পাওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার, টি. বি. রোগ ধরা পড়বার অনেক আগে থেকেই সুকান্ত একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় কোনো পত্রিকা অফিসে কবিতা পৌঁছে দেওয়া বা পারিশ্রমিক নিয়ে আসার কাজটা আমরাই করতাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে যাবার আগের সপ্তাহে সুকান্ত 'বসুমতী' অফিসে গিয়ে ঐ কথা বলছেন এবং এই রকম লেখাও বাজারে 'স্মৃতিকথা' হিসেবে চলছে। সকলেই জানেন যে, সুকান্ত ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকেই নারকেলডাঙ্গার বাড়ি ছেড়ে শ্যামবাজারে চলে যান এবং সেখানে গিয়েই অবশেষে তাঁর রোগ ধরা পড়ে। এর আগে কেউ জানত না যে, তিনি ইনটেস্টাইনাল টি. বি. তে ভুগছেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সুকান্ত যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হবার দু'সপ্তাহ আগে প্রাণতোষবাবু একদিন বর্ষাতে ভিজতে ভিজতে নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাড়িতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং 'চারাগাছ' কবিতাটি নিয়ে এলেন। প্রাণতোষবাবুর চমক লাগাবার মতো বিবৃতির এইখানেই শেষ নয়। এর পরের চমক হচ্ছে যে, পরের সোমবারই সুকান্ত তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে সোজা 'বসুমতী' অফিসে গিয়ে প্রাণতোষবাবুকে বলছেন, "যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে বেড পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হব।"

এই হলো স্মৃতিকথা এবং প্রতিটি সঙ্কলন গ্রন্থে এই ধরনের লেখা স্থান পাচ্ছে।

প্রাণতোষবাবুর স্মৃতিচারণা পড়তে গিয়ে দেখেছি মিথ্যাচারের সমস্ত সীমা তিনি লঙ্ঘন করেছেন। এ পর্যন্ত যা বলা হলো তার পরে এই লেখকের তুল্য দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কিনা পাঠকরাই বিচার করবেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শেষেরও আবার শেষ আছে। সেটুকু এবার শুনুন।

যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে যাবার আগের সপ্তাহে সুকান্ত তো 'বসুমতী' অফিসে গেলেন এবং সেদিন সুকান্তর সঙ্গে না-কি গিয়েছিলেন অরুণাচল বসুও। প্রাণতোষবাবু সুকান্তর মুখ থেকে টি. বি. হাসপাতালে বেড পাবার কথা শুনে সুকান্তকেই জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন থাকতে হবে? ডাক্তার কি বলেছেন?" এই প্রশ্ন দুটি জিজ্ঞাসা করার পর কি হলো?

প্রাণতোষবাবু লিখছেন: "আর কোনো জবাব নেই সুকান্তর মুখে। সে যেন মূক। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সকলেই স্তব্ধবাক। কবি অরুণাচল বসু খানিক বাদে বললেন —চল সুকান্ত, আজ ওঠা যাক।"

প্রাণতোষবাবু এখানে কি সাংঘাতিক একটা suspense বা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছেন দেখুন! সত্যিই তো ব্যাপারটা কি, আমারও তো ভেবে পাচ্ছি না। কি হতে পারে? কিন্তু এর পরেই একটা বোমা ফাটাবার মতো ভয়ঙ্কর খবর দিলেন প্রাণতোষবাবু। তিনি লিখেছেন—

"উঠে পড়ল সুকান্ত। অরুণাচল চুপি চুপি আমাকে বললেন —ও শুনতে পায়নি আপনার কথা। জানেন তো সুকান্ত ইদানীং আর কানে শুনতে পায় না।"

অরুণাচল বসু বলছেন, সুকান্ত ইদানীং আর কানে শুনতে পায় না ! তা'হলে সুকান্ত টি. বি. হাসপাতালের যাবার ব্যবস্থা হবার পূর্ব পর্যন্তও ভালোই কানে শুনতেন। এমন কি কদিন আগে প্রাণতোষবাবু যখন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তখনো পর্যন্ত তাঁর কানে কোনো দোষ দেখা দেয়নি, অন্তত প্রাণতোষবাবু সে' রকম কিছু ধরতে পারেননি। এই রকম সব সাচ্চা বিবৃতির পরে আমরা যে সব বুড়বক্ বনে যাচ্ছি ! কিছুদিন দেখা না হলে অদর্শনের ব্যথা বাজে যাঁর মনে এবং সে'জন্যে যিনি সুকান্তর বাড়িতে ছুটে যান তিনি সুকান্তর যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে যাবার এক সপ্তাহ আগে জানতে পারলেন যে, সুকান্ত ইদানীং (!) আর কানে শুনতে পায় না। এর পর আর কি বলার থাকে !

সুকান্তর বয়েস যখন তের-চৌদ্দ তখনকার একটি ঘটনা লিখেছেন ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সুকান্তর জীবনীগ্রন্থে। বিপিন মিত্র লেনের বাড়িতে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে সুকান্ত এমন একটা জায়গায় লুকিয়েছিলেন যে এক মহিলার বাক্যবাণ তাঁর ওপরে বর্ষিত হচ্ছিল।

ভূপেনবাবু লিখছেন, "সুকান্ত কানে কম শোনে, তাই এই একটানা বাক্য-বাণ তার কানে পৌঁছয়নি।"

প্রাণতোষবাবু জানতেন যে মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে কাব্য অনেক উপযোগী, তাই কাব্য দিয়েই তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন। এ কাব্যের চরিত্র অবশ্য আলাদা। এ কাব্যের ভিত্তি ভাবালুতা। ভাবালুতার আড়ালে সব মিথ্যাকে চাপা দেওয়া যায়, অন্তত যারা ভাবালুতার আশ্রয় নেয় তারা তাই মনে করে। প্রাণতোষবাবু লিখছেন—

"জবাব মিলল না সুকান্তর। কিছুকাল পরে জবাব এলো এক চিঠিতে। লিখলে, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন।

"তারপর আর হাসপাতাল থেকে ফিরল না চিরকিশোর সুকান্ত। কোথায় যে গেল কে জানে।"

রীতিমতো কাব্য। এরপরেও যদি এই 'স্মৃতিকথা' পাইকারীভাবে সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে স্থান না পায় তা'হলে তার জন্যে পাঠকদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈকি ! তাই তো দুই বাঙলার প্রখ্যাত সম্পাদক, যিনি কখনো সাময়িক পত্রিকা এবং কখনো পুস্তক সম্পাদনা করে প্রগতি সাহিত্যের দিক নির্দেশ করে থাকেন সেই জিয়াদ আলি সাহেবও বাঙলাদেশের প্রকাশক 'খান ব্রাদার্স'-এর হয়ে 'সুকান্ত পরিচয়' সঙ্কলন করবার সময় প্রাণতোষবাবুর প্রবন্ধটিকে তাঁর গ্রন্থে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন।

এ-বার আর একটু তথ্যের ব্যাপারে আসা যাক। প্রাণতোষবাবুর বিবৃতি অনুযায়ী 'চারাগাছ' কবিতাটি সুকান্ত টি. বি. হাসপাতালে যাবার আগের সপ্তাহেও 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়নি। তিনি সবে সেটা সুকান্তর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো ঐ কবিতা সুকান্ত নারকেলডাঙ্গা ছেড়ে শ্যামবাজারে যাবার বহু আগেই 'মাসিক বসুমতী'তে ছাপা হয়ে গেছে এবং আমি সুকান্তর চিঠি নিয়ে গিয়ে বসুমতী অফিস থেকে সেই কবিতা বাবদ পারিশ্রমিকও নিয়ে এসেছি। আমরা তখনো কেউ জানিই না যে এর পরে সুকান্ত শ্যামবাজারে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে তাঁর টি. বি. রোগ ধরা পড়বে বা তিনি যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হবেন।

সুকান্ত শ্যামবাজার থেকে সম্ভবত ৭ই মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে সরলা বসুকে একটি চিঠিতে লিখছেন—

"...দিনরাত পেটে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখন ওষুধ খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

"শীগ্‌গিরই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হব।..."

এর পর ২০শে মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে ঐ শ্যামবাজার থেকেই সরলা বসুকে আর একখানা চিঠিতে লিখছেন—

"...আবার আমার পেটের অসুখ ও পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তবে আজ একটু ভাল আছি।

দিন সাতেকের মধ্যেই হাসপাতালে যাব। সেখান থেকে পরে যাব আজমীড়।..."

এই উদ্ধৃতি দুটির সঙ্গে পাঠকরা মিলিয়ে নিন প্রাণতোষবাবুর বক্তব্য : 'অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবু-ডুবু বেলেঘাটা অঞ্চল।' নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে 'চারাগাছ' কবিতা নিয়ে যাচ্ছেন তিনি এবং তার পরের সপ্তাহেই সুকান্ত নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে 'বসুমতী' অফিসে গিয়ে বলছেন, 'যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে বেড পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হব।'

গেলাসের অনেক মাহাত্ম্য জানা আছে, কিন্তু এমন জলজ্যান্ত স্মৃতিকথার মাহাত্ম্য এই প্রথম চোখে পড়ল।

আর একটা কথা। প্রাণতোষবাবুর বিবৃতি থেকে মনে হয় 'বসুমতী' কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ প্রাণতোষবাবুরা যেন সুকান্তকে একেবারে দু'হাতে ঢেলে টাকা দিতেন। 'বসুমতী' অফিসে গিয়ে সুকান্ত তাঁকে বলছেন, "এখন থেকে চিঠি পত্রিকা, টাকা-কড়ি সবই ওখানে পাঠাবেন।" ওখানে অর্থাৎ যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে। কিন্তু এতখানি মহানুভব যে তাঁরা ছিলেন না তার প্রমাণ সুকান্তর যে চিঠিটা নিয়ে আমি 'বসুমতী' অফিসে প্রাণতোষবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। সেই চিঠির উল্লেখ আমি 'সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন' প্রবন্ধে করেছি।

এই প্রবন্ধটি আমি সুকান্তর একটি কবিতার দুটি পংক্তি দিয়ে শেষ করতে চাই। কবিতাটির নাম 'আমার মৃত্যুর পরে'। শেষ পংক্তি দুটিতে তিনি বলছেন—

"আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর॥"

কিন্তু 'প্রত্যেক অন্তর' যদি তাই হতো তা'হলে মিথ্যা স্মৃতিকথা লিখে 'যত অনাদর' এবং 'লাঞ্ছনার বেদনায়' আত্মতৃপ্তি লাভ করত না কেউ। প্রাণতোষবাবু তার জলজ্যান্ত নিদর্শন।

সুকান্তর দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশ হতে চলেছে তখন আজ সুকান্তর মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পরে তাঁর লেখা দুটি কবিতা পেলাম। এই ঘটনা কোনো অঘটন নয়, ঘটতেই পারে, তবে আকস্মিক তো বটেই। কিন্তু কবিতা দুটি সম্পর্কে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলবার আছে। সেই কথাগুলো না বলে তো এ অবস্থায় সাধারণের সামনে কবিতা দুটিকে মুক্তি দেওয়া যাচ্ছে না। সুকান্ত নিজে কবিতা দুটিকে মুক্তি-পত্র দেননি। কিন্তু আজকে আমি বা আমরা যখন তাকে প্রকাশ করতে চাইছি তখন তার সম্পর্কে যা বক্তব্য তাকে বাদ দেওয়াও অসম্ভব। সেই বক্তব্যকে আশ্রয় করেই একমাত্র কবিতা দুটি অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আজ আমার মনে পড়ল। সে ঘটনাও চৌত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমি সবে সুকান্তর ঘরে পা দিয়েছি, দেখলাম সুকান্ত বিছানার ওপর বসে আছেন, ঘরে আর কেউ নেই (সাধারণভাবে ঘরে কোনো দিনই বিশেষ কেউ এই সময় থাকত না, মাঝে মধ্যে অশোক এবং অমিয় ছাড়া), মেঝেতে একসারসাইজ খাতার সাইজের এক শিট্ কাগজ চার ভাঁজ করা পড়ে আছে, হাওয়ায় উড়ে পড়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সুকান্তর হাতের লেখা দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিলাম। সুকান্তর পাশে গিয়ে বসে কাগজখানা খুললাম, একটা কবিতা লেখা রয়েছে, খানিকটা অংশে কাটাকুটি, কবিতাটা আমার ভালোই লাগল, এতক্ষণ সুকান্ত নির্নিমেষ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, মুখে কথা ছিল না। কাগজখানা তাঁর হাতে দিলাম, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ দিয়ে সমস্তটা পড়লেন তারপর মুচকি হেসে টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম, তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর কপি আছে?' হেসে বললেন, 'না। ও কিছু হয়নি।'

এই ঘটনাটার উল্লেখ আমি করলাম এই কথা বলবার জন্যে যে, সুকান্ত নিজের রচনা সম্পর্কে অত্যন্ত নির্মম ছিলেন। যে কবিতাটি সম্পর্কে তিনি সব দিক থেকে সন্তুষ্ট হতেন সেটা সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন ছাপাবার জন্যে, কিন্তু যে কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো রকম দ্বিধা থাকতো সে কবিতার কপালে জুটতো চরম

দুর্ভোগ। টুক্‌রো-টাক্‌রা কাগজে কবিতা লিখতেন, সেগুলো ছিল সাধারণত ছেঁড়া এক্সারসাইজ খাতার পৃষ্ঠা। একখানা বোর্ড বাঁধাই এক্সারসাইজ খাতা ছিল, তার মধ্যে, কখনো বিছানার নীচে, কখনো টেবিলে অন্য কোনো বই-এর পাতার মধ্যে কবিতাগুলোর স্থান হতো। যেগুলো তাঁর নির্বাচনে সব দিক দিয়ে উতরে যেত সেগুলো লম্বা খাতাখানাতে বা এক্সারসাইজ খাতাতে ফেয়ার করা হতো। অনেক সময় এক্সারসাইজ খাতাতে ফেয়ার করা কবিতার পৃষ্ঠাও খাতা থেকে ছিঁড়ে সরিয়ে ফেলতে দেখেছি, তখন তারা তাঁর সমর্থন হারিয়ে অন্য কোনো স্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে।

যে কবিতা দুটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে বসেছি সে কবিতা দুটি তিনি ফেয়ার করেছিলেন, তার পরেও কবিতা দুটি আবার সংশোধিত হয়েছে। ছোট কবিতাটি, যেটির নাম তিনি দিয়েছেন 'অপসারণ', তার শেষ স্তবকটি তো আবার কেটেকুটে দিয়ে একেবারে নতুন করে লিখেছেন। কিন্তু এত করেও ওরা প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে হাজির হবার অনুমতি পায়নি কবির কাছ থেকে।

কিন্তু কয়েকটা দিক দিয়ে এই কবিতা দুটির দারুণ গুরুত্ব রয়েছে। আমার কাছে অন্তত তাই মনে হয়েছে বলে আমি এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি। 'ছাড়পত্র'-এর "সেপ্টেম্বর '৪৬" এবং 'ঘুম নেই'-এর "একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬" কবিতা দুটির রচনার সমসাময়িক কালই হচ্ছে এই কবিতা দুটির রচনাকাল। মনে রাখতে হবে এই সময় কবি সুকান্ত গদ্য কবিতায় একটি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করেছেন (সুকান্ত, স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তা' সত্ত্বেও রচিত হচ্ছে "একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬" এবং "মুক্তবীরদের প্রতি" জাতীয় ছন্দবদ্ধ কাব্য। "চারাগাছ" কবিতা এরও আগে রচিত। কবির আগ্রহ এই সময় ছন্দের থেকে গদ্যের দিকে বেশী ঝুঁকেছে, বক্তব্যের দিকে আরও বেশী ঝুঁকছেন কবি। আর রাজনীতি? কবির কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনাবলী বরাবরই ছিল, কিন্তু এই সময় কতকগুলি কবিতায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশের মধ্যেকার ঘটনাপ্রবাহ দারুণভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। তার কারণ ঐ ঘটনাগুলো সারা দেশটাকে ধরে তখন ঝাঁকানি দিচ্ছে। কবির মনে কি সন্দেহ হয়েছিল যে, এই ধরনের কবিতার সাময়িক মূল্যটাই বেশী হয়ে যাচ্ছে? এই কবিতাগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে কি কবির মনে দ্বিধা ছিল? এই ধরনের একটা প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে, তাই প্রশ্নটা উত্থাপন করলাম। কিন্তু তা'হলে "সেপ্টেম্বর '৪৬" 'ছাড়পত্র' গ্রন্থে স্থান পেল কি করে? এই সময় যত কবিতা লেখা হয়েছে সব ক'টিই আমি কবির মুখ থেকেই শুনেছি, কবিই প্রথমে আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন, তারপর আমি হাতে নিয়ে দেখেছি।

বর্তমান কবিতা দুটির মধ্যে আমি অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি 'অপসারণ' কবিতাটিকে।

এই প্রথম সুকান্তর অনুরাগী পাঠকেরা কবির কাছ থেকে এমন একটি কবিতা পাবেন যাতে পরিষ্কারভাবে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া-জমিদার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বুর্জোয়া-জমিদার নেতৃত্ব চায়নি ভারতবর্ষের বিপ্লবী জনগণের মোর্চা দিল্লী অভিযান করে ক্ষমতা দখল করুক এবং দুশো বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাক। জনগণ যখন এগিয়ে যেতে চাইছে ঐ নেতৃত্ব তখন তাদের এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না, রাশ টেনে রাখছে। তাদের শ্রেণী-স্বার্থেই জনগণের সংঘবদ্ধ অভিযানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়নি তারা, আপোষ আলোচনার মধ্যে দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা-হস্তান্তর চেয়েছিল। রাজনৈতিক সচেতন কবি অসীম দক্ষতার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সত্যটাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। ট্রেনের ড্রাইভার হচ্ছে জাতীয় নেতৃবর্গ, যারা বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই ড্রাইভার ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুক্তিকামী জনগণের বাহিনীকে দিল্লী নিয়ে যেতে চায় না। ইঞ্জিনটাও জনগণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে—

> "ইঞ্জিনের বুকে শোন কী দুরন্ত অস্থির আকুতি
> ড্রাইভার কোথায় তুমি? কোথা হেড-লাইটের দ্যুতি?
> ড্রাইভার! ড্রাইভার! তুমি এখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে?"

ভারতবর্ষের জনগণ রোষে ফুলে উঠছে, তারা স্টেশন ছাড়ার দাবি জানাচ্ছে, তারা আর দেরি সহ্য করতে রাজি নয়—

> "স্টেশন ছাড়ার দাবী। যাত্রী-জন ফুলে ওঠে রোষে।
> দেরী কেন? কেন দেরী? জন-পুঞ্জে ওঠে কলধ্বনি।
> ড্রাইভার! সময় নেই, ট্রেন ছাড়ো সবেগে এখনি।"

জনগণ দিল্লী অভিযানের জন্যে তৈরী, ট্রেনে উঠে বসে আছে তারা, কিন্তু ট্রেনটা দিল্লী নিয়ে যাবার দায়িত্ব যে ড্রাইভারের ওপর তার গাড়ি ছাড়বার কোনো ইচ্ছাই নেই। বুর্জোয়া-জমিদার স্বার্থের প্রতিনিধি এই ড্রাইভার তখনকার জাতীয় নেতৃবর্গ। তারা জানে জনগণ যদি দিল্লী পৌঁছায় তবে বিপ্লব ঘটে যাবে, নেতৃত্ব তখন অন্য শ্রেণীর হাতে চলে যাবে, তা'হলে আর দিল্লীর মসনদ কব্জা করা যাবে না, জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থানকেও দাবিয়ে দেওয়া যাবে না। এই জনগণ কারা, যারা ট্রেনে উঠে বসে আছে দিল্লী যাবে বলে? এরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ—

> "বাঙালী, বেহারী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও ওড়িয়া, মারাঠি,
> মাদ্রাজী, আসামী আর বোম্বেওয়ালা, কাশ্মীরী, গুজরাটী,"

এরা কি জন্যে বসে আছে ট্রেনে? এদের উদ্দেশ্য কি?

> "সবাই প্রতীক্ষা-ব্যগ্র, মুখে এক অদম্য জিজ্ঞাসা,
> পাশাপাশি ঘেঁষা ঘেঁষি সকলের চোখে তীব্র আশা।

ড্রাইভার! নিঃশব্দ কেন? কেন তার দৃষ্টি নয় স্তব্ধ
কখন দিল্লীর পথে রওনা হবে জনতার ট্রেন?"

কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা এলে সে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব তো আপোষকামী বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস-লীগ নেতাদের হাতে আর থাকবে না। তাই এই নেতৃবর্গ তখন বৃটিশকে যতটা ভয় করে তার থেকে বেশী ভয় করতে আরম্ভ করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের অভ্যুত্থানকে। এই সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে কবি ঐ নেতৃত্বকে, এ ক্ষেত্রে ট্রেনের ড্রাইভারকে চরম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন—

"ইঞ্জিনের বুকে বাষ্প, কী অবাধ্য! ছুটে যেতে চায়
হঠাৎ লেগেছে দোলা এই ট্রেনখানার চাকায়,
ক্ষুব্ধ যাত্রী ফুঁসে ওঠে: "ড্রাইভার! পদত্যাগ করো,
আমরা চালাবো ট্রেন।" ভারতবর্ষ কাঁপে থরো থরো।"

'পদত্যাগ কর, আমরা চালাবো ট্রেন।' —জনগণের এই চ্যালেঞ্জ তখনকার ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবর্গ বুঝতে পেরেছিল, তাই জনতার ট্রেনকে তারা স্টেশনেই আটকে রেখেছিল, সে ট্রেনকে আর তারা স্টেশন ছাড়তে দেয়নি। কবি সুকান্তর এই চ্যালেঞ্জ কার্যক্ষেত্রে রূপ নেবার আগেই বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ নেতৃবর্গের সঙ্গে বসে গোপনে ভাগ-বাটোয়ারা সমাধা করে নিয়েছিল এবং জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পেছনে ছুরি মেরেছিল।

সুকান্তর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এই কবিতাটি একটি অসাধারণ কবিতা বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত। যদি এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ এবং প্রতীকগুলিকে যথাযথভাবে না বুঝে কেউ কবিতাটি পড়েন তবে কবিতাটিকে খুব সাধারণ মানের কবিতা বলেই মনে হবে, কিন্তু এর মধ্যেকার প্রতীক এবং অর্থকে যথাযথভাবে বুঝলে, ভারতবর্ষের যুগ-সন্ধিক্ষণের একটি ঐতিহাসিক সত্যকে এর মধ্যে আবিষ্কার করলে, তখন আর কবিতাটির অসাধারণত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এ কবিতাটি হলো একটি ঐতিহাসিক দলিল এবং এই দলিল ভারতবর্ষের জনগণ যত্নের সঙ্গে রক্ষা করবেন।

এ-বার দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পর্কে আলোচনায় আসি। কবিতাটির নাম 'উপস্থিতি' এবং সুদীর্ঘ কবিতা, কিন্তু বড়ই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় কবিতার শেষ পৃষ্ঠাটি হারিয়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া অংশটি উদ্ধারের আর কোনো উপায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কবিতাটির তিনটি অংশ পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন কবি। প্রথম অংশটি স্বতন্ত্রভাবে নিলে সেটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি, দ্বিতীয় অংশটি সুকান্তর সৃষ্টির বিচারে দুর্বল রচনা, তৃতীয় অংশটির যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে রচনার মান আবার উন্নত হয়েছে এবং মনে হয় শেষটুকু কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষরে চিহ্নিত ছিল। কারণ আমি সুকান্তর সংস্পর্শে থেকে লেখক

হিসেবে তাঁকে যতটা জেনেছি এবং বুঝেছি তাতে লেখার শেষটাকে তিনি সর্বদাই সুন্দরতম করার চেষ্টা করতেন।

এই কবিতাটির মধ্যে সুকান্তর কবি ভাবনার একটা দিক যে 'আশাবাদ' সেটাই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আশাবাদের ভিত্তি যে শুধু 'ভাবালুতা' বা 'সৎ ইচ্ছা' নয়, এই আশাবাদ যে দৃঢ় ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে দৃঢ় ভূমি যে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' তার স্বীকৃতি এই কবিতাটিতে রয়েছে। কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি একের পর এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে এনেছেন। কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের রচনা দুর্বল হবার কারণ সেইখানেই, তথ্যে ভারাক্রান্ত হলে গীতি কবিতায় উন্নত মানের রসসৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি হয়।

সুকান্তর এই সময়কার অনেকগুলি কবিতাতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতার বুকে যে দাঙ্গার শুরু তার প্রতিক্রিয়া কালো ছায়া ফেলেছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবি এই সময় বার বার করে দেশবাসীকে বোঝাতে চাইছেন যে—এই দাঙ্গাই শেষ কথা নয়। "সেপ্টেম্বর '৪৬" কবিতায় কবি বলেছেন—

"কলকাতায় শান্তি নেই।
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।"

কলকাতার অবস্থা বলতে গিয়ে বলছেন—

"মূর্ছিত শহর
এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ ;"

কিন্তু ঐ কবিতাটিই শেষ করছেন কবি এই বলে—

"অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥"

"একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬" কবিতাতে ঐ দাঙ্গার কথা স্মরণ করেই বলছেন—

"বার বার জিতে, জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে—
বিদেশী! তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।"

"মুক্ত বীরদের প্রতি" কবিতাতে ঐ দাঙ্গার কথা মনে করেই বলেছেন—

"তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর! অবাক অভ্যুদয়!
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।"

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে ঐ কবিতাটিতেই—

"জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা!

গৃহযুদ্ধের ঝড় রয়ে গেছে—
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান,
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্‌খান্‌।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত;
তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।"

ঐ কবিতাতেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—

"যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান,
আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।"

বর্তমানে যে কবিতাটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেখানেও এই আত্মঘাতী দাঙ্গার স্মৃতির ভার বহন করেই কবিতা লিখতে বসেছেন কবি। মনে হয় আরও সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীর মনে আস্থা আনবার জন্যে কবি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখার সঙ্কল্প করেন। চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্তেই তো কবি-সাহিত্যিকদের ওপর দায়িত্ব বর্তায়! মানুষের চেতনাকে শাণিত করে, মূল লক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে তুলে ধরে বিশ্বাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। "উপস্থিতি" কবিতার শুরু এই ভাবে—

"আমরা এখনো আছি:
—এই আজ আমাদের সদম্ভ ঘোষণা,"

এই ঘোষণার পেছনে গৃহযুদ্ধের বিচ্ছেদটা রয়েছে—স্পষ্টই বোঝা যায়। না হলে এই ঘোষণার প্রয়োজনই হতো না। কবিতার দ্বিতীয় অংশটিতে গিয়ে সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ইতিহাস থেকে একটার পর একটা ঘটনা উদ্ধৃত করে কবি দেখাচ্ছেন পৃথিবীর ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক কে, কে বা কারা ইতিহাস রচনা করে। ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং বর্মায় একের পর এক 'আমার' বা জনগণের ভূমিকাকে দেখালেন কবি। তারপর সেই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি ফিরলেন ভারতবর্ষে—

"এবার আমরা এসেছি ক'লকাতায়
সঙ্গে এনেছি অনেক অভিজ্ঞতা;
জুলাই ঊনৃতিরিশের জয়ের পথে
ভুলবে না কেউ ফেব্রুয়ারীর কথা।"

১৯৪৬ সালের তেরই ফেব্রুয়ারী এবং ঊনত্রিশে জুলাই কলকাতার মানুষের যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী রূপ সে তো ফ্রান্স-রাশিয়া-স্পেন-চীন-ইন্দোনেশিয়া-বর্মার ঐতিহাসিক সংগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত, তারই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু ঊনত্রিশে

জুলাইয়ের সামান্য কটা দিন বাদেই যে এলো ১৬ই আগস্ট! এ বার এই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সুকান্তর মতো কবির দায়িত্ব কি ? সে দায়িত্ব হলো জনমনে ভেঙে যাওয়া আশাকে আবার উদ্দীপ্ত করে তোলা এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপরে সেই আশাকে দাঁড় করানো—

"জনতার বুকে আমরা জাগাই আশা
আমরা এখানে গ'ড়েছি বিশাল ঘাঁটি,
গৃহযুদ্ধেও হবে না তা ছারখার"
আমরা সজোরে কামড়ে ধরেছি মাটি।"

গৃহযুদ্ধেও সেই আশা যাতে ছারখার না হয় তারই জন্যে তো কবি দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দিয়ে জনগণের চেতনাকে সমৃদ্ধ করলেন, 'আশা'টাকে দাঁড় করালেন সুদৃঢ় জমির ওপর। এই দীর্ঘ কবিতাটি লেখবার পেছনে কবির মূল উদ্দেশ্যটি যে কি ছিল তা' নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পরের স্তবকে এই দাঙ্গা বা গৃহযুদ্ধের পেছু-হটাকে আক্রমণ করেই বলেছেন—

"আবার আমরা ছুটবো গড়ের মাঠে
অকটারলোনি মনুমেন্ট জানি ফের,
রক্তের ঝড় থেমে গেলে একেবারে
জয়-স্তম্ভ হবে শেষে আমাদের।"

ইতিহাসে শেষ কথা বলে জনগণ, পাঠকদের মনে এই বিশ্বাসকে কবি ফিরিয়ে আনলেন, তারপর কবিতার তৃতীয় অংশে প্রত্যক্ষভাবে আরও জোরের সঙ্গে 'আমরা' অর্থাৎ জনগণের অস্তিত্বকে ঘোষণা করলেন—

"আমরা এখনো আছি—
চিরকাল যেমন ছিলাম।"

গৃহযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্বকে মুছে দিতে পারবে না। চক্রান্তকারীরা, জনগণের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবেই এবং মুছে যাবে ইতিহাসের পাতা থেকে। শেষ পর্যন্ত থাকব আমরাই—

"অনেক শতাব্দী পরে
জেনো বেঁচে থাকব আমরাই;
মানুষের ঘরে ঘরে।
ইতিমধ্যে বহু ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা —মহামারী
বহু গৃহ-যুদ্ধ, বহু বিদ্রোহ, বিপ্লবে বার বার
আমরাই দেখা দেবো।"

আমি আগেই যে কথা বলেছি সেই কথাতেই আবার আসছি। কবি একাধিক কবিতায় বিভিন্ন জায়গায় ইতিহাসের একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের মুহূর্তে জনমনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার যে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন তাকেই একটি দীর্ঘ কবিতার

মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে ইতিহাসের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে একটা বিরাট সৃষ্টির কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারই পরিণত ফসল "উপস্থিতি"। কিন্তু স্পষ্টতঃই কবিতাটি কবির কাছে পুরোপুরি সার্থকতামণ্ডিত বলে মনে হয়নি। তার কারণ আমি বলেছি, রচনার ত্রুটিটা দ্বিতীয় অংশে ঘটেছে বিশেষ কারণে। পরিতাপের বিষয় কবিতাটির শেষ অংশটা পাচ্ছি না। কবি, যে ত্রুটির জন্যেই এটাকে জনসমক্ষে প্রকাশ না করুন, শেষ অংশটি পেলে আমাদের রায় আমরা দিতাম, কারণ কোনো কবিতা যে প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত সমান হৃদয়গ্রাহী হবে এমন দাবি সব সময় করা চলে না বা সেই দাবি পূরণও সব সময় সম্ভব হয় না। কবিতার শেষ অংশটি যে শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত হতো এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে কবিতা পাঠের অনুভূতি একটা নতুন স্তরে পৌঁছাত এবং পাঠক হিসেবে এই কবিতাটিকে তখন একটা সার্থক সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতে কারো মনেই কোনো দ্বিধা থাকত না। কবিতাটির খণ্ডিত রূপ কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা জানি না। যদি হয়, তা'হলে আর একটি সার্থক কবিতা কবির কাছ থেকে আমরা পাব।

আলোচনা শেষ করবার আগে আর একটি প্রাসঙ্গিক কথা সেরে নিই। অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলো যে, যেহেতু কবিতা দুটি এখনো পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি তাই পাঠকদের পক্ষে কবিতা দুটির অনুপস্থিতিতে আমার এই আলোচনাকে অনুসরণ করা একেবারেই সম্ভব হবে না, তাই প্রয়োজনবোধে কবিতা দুটি এই সঙ্গে মুদ্রিত করা হচ্ছে যাতে পাঠক-সাধারণ কবিতা দুটি পড়ে আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ধারণ এবং নিজস্ব মূল্যায়ন করতে পারেন।

অপসারণ

ড্রাইভার ! সিগ্‌নাল নীচু, শোনো ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
সময় হ'য়েছে, দেখো, গার্ডের বাতি নীল রঙ,
ইঞ্জিনের বুকে শোনো কী দুরন্ত অস্থির আকূতি,
ড্রাইভার কোথায় তুমি ? কোথা হেড-লাইটের দ্যুতি ?
ড্রাইভার ! ড্রাইভার ! তুমি এখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে ?
স্টেশন ছাড়ার দাবী । যাত্রী-জন ফুলে ওঠে রোষে ।
দেরী কেন ? কেন দেরী ? জন-পুঞ্জে ওঠে কলধ্বনি ।
ড্রাইভার ! সময় নেই, ট্রেন ছাড়ো সবেগে এখনি ।
বাঙালী, বেহারী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও উড়িয়া, মারাঠী,
মাদ্রাজী, আসামী আর বোম্বেওয়ালা, কাশ্মীরী, গুজরাটী
সবাই প্রতীক্ষা-ব্যগ্র, মুখে এক অদম্য জিজ্ঞাসা,
পাশাপাশি ঘেঁষা ঘেঁষি সকলের চোখে তীব্র আশা ।
ড্রাইভার ! নিঃশব্দ কেন ? কেন তার দৃষ্টি নয় শ্যেন
কখন দিল্লীর পথে রওনা হবে জনতার ট্রেন ?

ইঞ্জিনের বুকে বাষ্প, কী অবাধ্য ! ছুটে যেতে চায়
হঠাৎ লেগেছে দোলা এই ট্রেনখানার চাকায়,
ক্ষুব্ধ যাত্রী ফুঁসে ওঠে : "ড্রাইভার ! পদত্যাগ করো,
আমরা চালাবো ট্রেন ।" ভারতবর্ষ কাঁপে থরো থরো ॥

উপস্থিতি

আমরা এখনো আছি :
—এই আজ আমাদের সদম্ভ ঘোষণা,
দুরন্ত দুরাশা বুকে মরি আর বাঁচি ;
ঝড়ের মুহূর্ত আজো গোনা—
এই শুধু আমাদের পুঁজি।

দিগ্বিদিকে খুঁজি,
কোথায় বিক্ষুব্ধ প্রাণ মাথা খোঁড়ে
অন্ধকার দেওয়ালের গায়ে,
শৃঙ্খল কোথায় পায়ে
ফোটায় রক্তের ফুল অন্ধকার ভোরে।

বিদ্রোহের ইস্তাহার হাতে নিয়ে
ছুটে যাই যেখানে জনতা
বলে বহু অভাবের কথা।
াস চোখ তোলে,
সন্দেহের মাথা দেয় উঁকি
ভাবে তারা, এতোগুলি ক্ষুধা-ক্ষিপ্ত জনতার ঝুঁকি
নিতে কি সক্ষম আমরা ?
শোনা যায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
তবুও বিশ্বাস
মুঠো ভরে এনে দিই তাদের দরজায় ;
তখনি গর্জায়
দুর্বার ক্ষুধিত সিংহ :
"রুটি দাও —দাও আচ্ছাদন"
সে ক্রুদ্ধ গর্জন
কাঁপায় অনেক সিংহদ্বার।

এই সব বিদ্রোহের ভার
আমাদের। গর্বে বুক ফুলে ওঠে—
বিপ্লবের অতি কাছাকাছি :
আমরা নিঃশব্দে বেঁচে আছি।

২

উচ্চকণ্ঠে জানাই আবার 'আছি'—
বহু শতাব্দী আমরাই আগে আগে,
আমরা যে চলি জনতা-কীর্ণ পথে :
যেখানে পায়ের শব্দে ক্ষুধিত জাগে।

মনে নেই সেই ফ্রান্সের বিপ্লব—
বাস্তিল-ভাঙা জনতার কোলাহল
রক্তে অত্যাচারীরা গিয়েছে ভেসে
লক্ষ জনতা বিস্ময়ে চঞ্চল।

প্যারিস! তোমাকে আমরা যে বহুবার
করেছি রক্ত-চিহ্নিত উল্লাসে ;
এতো বিদ্রোহ এতো যুদ্ধের পরে
প্যারিসের পথে বুঝি স্বাধীনতা আসে।

আমরা গিয়েছি বারবার রাশিয়ায়
রক্তের স্রোত রয়েছে ডনের বুকে,
সফল রাশিয়া! তোমাকে নমস্কার,
আমাদের কাজ আরো আছে সম্মুখে।

স্পেনের কথা কি কখনো ভুলতে পারি ?
নাই বা বিজয়ী হ'লাম সে সংগ্রামে

আমরা লড়াই করেছি জীবন-পণ :
তাই তো জয়ধ্বনি আমাদের নামে।

আমরা সেজেছি সৈনিক চীনে গিয়ে
বছরের পর বছর যুদ্ধ চলে ;
প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোষ নেই,
দেখো, আজ সারা চীন আমাদের দলে।

ইন্দোনেশিয়া, বর্মায়ও চুপে চুপে
আমরা গড়েছি, করেছি আন্দোলন,
অনেক মরেছি, মারছি অনেক তাই
লাল হ'য়ে ওঠে ক্রমশ পূর্ব-কোণ।

এবার আমরা এসেছি কলকাতায়
সঙ্গে এনেছি অনেক অভিজ্ঞতা ;
জুলাই উন্‌তিরিশের জয়ের পথে
ভুলবে না কেউ ফেব্রুয়ারীর কথা।

জনতার বুকে আমরা জাগাই আশা
আমরা এখানে গড়েছি বিশাল ঘাঁটি,
গৃহযুদ্ধেও হবে না তা ছারখার
আমরা সজোরে কামড়ে ধরেছি মাটি।

আবার আমরা ছুটবো গড়ের মাঠে
অক্‌টারলোনি মনুমেণ্ট জানি ফের,
রক্তের ঝড় থেমে গেলে একেবারে
জয়-স্তম্ভ হবে শেষে আমাদের।

৩

আমরা এখনো আছি—
চিরকাল যেমন ছিলাম।
অনেক শতাব্দী পরে
জেনো বেঁচে থাকবো আমরাই,
মানুষের ঘরে ঘরে।
ইতিমধ্যে বহু ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-মহামারী
বহু গৃহ-যুদ্ধ, বহু বিদ্রোহ, বিপ্লবে বার বার
আমরাই দেখা দেবো।
আমরা বাঁধবো বাসা
বৃদ্ধদের ক্লান্ত চোখে আশার আশ্বাসে,

পরিশিষ্ট

মানবতাবাদ-প্রসঙ্গে গোর্কি

"Proletarian humanism demands an inextinguishable hatred for the bourgeoisie, for the power of the capitalists and their lackyes, for the parasites, facists, butchers and betrayers of the working class, a hatred for everything that causes suffering, for all who live on the suffering of hundreds of millions of people." —M. Gorky.

মানবতাবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোর্কি এক জায়গায় বলেছেন, "প্রকৃত মানবতাবাদ হচ্ছে সর্বহারার মানবতাবাদ, যা রাশিয়াতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তিটাকেই পরিবর্তিত করবার মহান আদর্শকে রূপ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে।" গোর্কি যখন এই কথা বলেছিলেন তখন রাশিয়াতে সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে এবং মহান্ লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে রূপ দেবার কাজে বিস্ময়কর অগ্রগতির পরিচয় সারা বিশ্বের সামনে উপস্থিত করেছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদকে গোর্কি 'মুখোশ' বা 'ভণ্ডামি' বলেছেন। পরের মেহনতের ওপর যারা ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তোলে সেই পরজীবী ধনিকশ্রেণী মুখে মানবতাবাদের কথা বলে, কিন্তু এরাই অর্থাৎ সেই ব্যবসায়ী এবং মিল-কারখানা বা ব্যাঙ্কের মালিক শ্রেণীই আবার সুযোগ পেলেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবার জন্যে যুদ্ধের মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে মুনাফা লোটে। গোর্কি তাই বলেছেন যে, যে-সভ্যতা অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যে দিয়ে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ভাগ্যে উপহার দেয় দারিদ্র্য, অনাহার এবং মৃত্যু সেই সভ্যতায় মানবতাবাদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বুর্জোয়াদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, তাদের কাছে মূল্য আছে কেবল অর্থের। এদের মুনাফাকে বাঁচাবার জন্যে, স্তূপীকৃত অর্থকে নিরাপদ রাখবার জন্য এদের সরকার নির্বিচারে গুলি চালাবে শ্রমজীবী নিঃস্ব মানুষের ওপর। এইভাবে একদিকে তারা নির্বিচারে নরহত্যা

করবে, মূল্যবান জীবনগুলোকে তথাকথিত আইনের আশ্রয় নিয়ে নির্মমভাবে বিনষ্ট করবে, অপরদিকে পশুদের ওপরে যাতে নির্দয় আচরণ না করা হয় তার জন্যে পশুরক্ষণ সমিতিতে গালভরা বক্তৃতা দিয়ে মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার করবে।

মানবতাবাদ সম্পর্কে গোর্কির মূল্যবান আলোচনা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আমি এই প্রবন্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং সর্বহারার মানবতা-বাদ সম্পর্কে গোর্কির সেই মূল্যবান বক্তব্যগুলিই গুছিয়ে উপস্থিত করবার চেষ্টা করব।

বুর্জোয়া শ্রেণী কখন মানবতাবাদের কথা বলতে আরম্ভ করল?—প্রশ্নটি উত্থাপন করে গোর্কি বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের ভণ্ডামিটা আরও স্পষ্ট করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র এবং সেই সামন্ততন্ত্রের তল্পিবাহক নেতা চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যখন তারা সংগ্রাম আরম্ভ করল তখনই বুর্জোয়া শ্রেণী প্রথম মানবতাবাদের কথা বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু নিজেদের জীবনের খুব স্বল্প দিনের অভিজ্ঞতাতেই বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে মানবতাবাদের আদর্শের বিরোধ এবং তার ফলে নিজেদের অসুবিধা-জনক অবস্থাটা বুঝে ফেলল।

মধ্যযুগের ধর্ম এবং চার্চ মানুষকে বলত, খৃষ্টের জন্যে মুখ বুঁজে কষ্ট সহ্য করে যাও। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ধর্মের কথা তোলা যেতে পারে, এখানেও ধর্ম মানুষকে সে কথাই বলে—কষ্ট দুঃখ ভগবানের দান। কখনো বলা হয় মানুষকে তিনি এইভাবে পরীক্ষা করেন, কখনো বলা হয় পূর্বজন্মের কৃত-কর্মের ফল সেটা।

ইউরোপে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক এবং কারিগর সম্প্রদায়ের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতায় এসে কিন্তু তারা আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল, "ধৈর্য ধর, আত্মসমর্পণ কর, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ যা' কিছু আছে আমাদের সেবায় নিয়োগ কর, ওপরওয়ালা এবং অত্যাচারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না।"

গোর্কি তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী পুরনো ধর্মীয় সুসমাচারগুলির মধ্যে মানবতাবাদের আমদানি করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, মানুষ নিধন যজ্ঞ, দস্যুবৃত্তি, প্রতারণা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বলে স্বীকৃতি দিলো, শুধু কি তাই, এইগুলিকে বলল প্রশংসনীয় কাজ। আর এ কথা তো সকলেই জানে যে, ঐ বৃত্তিগুলির চর্চা ছাড়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

গোর্কি বলেছেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদের মধ্যেকার মিথ্যাচার এবং ভণ্ডামিকে দেখিয়ে দেবার আজ আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী

আজ ফ্যাসিবাদকে চাগিয়ে তুলছে, নিজেদের মানবতাবাদের মুখোশ খুলে ফেলে দিচ্ছে। আসলে তাদের মানবতাবাদের মুখোশটা জীর্ণ হয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে, সেই মুখোশের আড়ালে আর তাদের শিকারী পাখির ধারালো দাঁতগুলো লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই মানবতাবাদের মুখোশটাও যে তারা আজ ত্যাগ করছে তার আরও একটা কারণ আছে, আসলে তারা বুঝতে পারছে যে, 'এই মানবতা-বাদই' তাদের আত্মদ্বন্দ্বের কারণ হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিনাশেরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বুর্জোয়ারা মানবতাবাদের কথা কেন বলে? এই প্রশ্নটাও গোর্কি বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেছেন। আসলে মানবতাবাদ বস্তুটিই বুর্জোয়াদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া সাহিত্যে মানবতাবাদ কথাটার উপস্থাপনা দেখতে পাই কেন তবে? গোর্কি বলছেন, একটু অনুসন্ধান করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। আসল ব্যাপার হলো, প্রবল সহানুভূতি সম্পন্ন এবং বোধশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন বুর্জোয়া জগতের বীভৎস দুষ্কর্মগুলো দেখে দেখে মনঃপীড়া ভোগ করেন তখন তাঁরা মানবিক ভালোবাসার কথা প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রচারের আসল উদ্দেশ্যটাই হলো বুর্জোয়াদের দুষ্কর্মের বীভৎসতাকে কিছুটা লাঘব করতে চেষ্টা করা। পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী শ্রেণীর পৃথিবী ব্যাপী 'সাংস্কৃতিক' কার্যকলাপের ফলে যথেচ্ছাচারী শাসন উৎপীড়ন অত্যাচারের ফলে এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ যখন ত্যক্ত বিরক্ত এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তাদের শান্ত করবার জন্যে মানবিক ভালোবাসার কথা প্রচারের অনুমতি বুদ্ধিজীবীদের জীবিকার প্রভু ঐ ধনিক শ্রেণী দিয়ে থাকে।

কিন্তু যেই সেই শ্রমজীবী মানুষের বিরক্তি সমাজ বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করতে যায় অমনি বুর্জোয়া শ্রেণী প্রত্যাঘাত হানে এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করে। আর বুর্জোয়া শ্রেণীর সেইসব মহান্ উদার লোকগুলো যারা মানবতাবাদের কথা প্রচার করে তারাই তখন বুর্জোয়াদের এই প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সমর্থন জানায়। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের ঘটনার পর বুর্জোয়া শ্রেণীর এই উদার মানবতাবাদী লোকগুলো অনুতাপ প্রকাশ করে একটা বই লিখেছিল, তাতে তারা বলেছিল, "সরকার যে ভাবে বেয়নেটের সাহায্যে জনগণের ক্রোধ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন তাতে সরকারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" রাশিয়ার সরকারের কর্তৃত্বে তখন ছিল স্টলিপিন, সে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে পাঁচ হাজার শ্রমিক এবং কৃষককে ফাঁসি দিয়েছিল। এই হলো গিয়ে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের প্রকৃত স্বরূপ।

বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যাঙ্ক মালিক, কামান-বন্দুক উৎপাদক ধনী ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পরজীবী ধনিক গোষ্ঠী পৃথিবীকে নিত্য নতুন যুদ্ধের

মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, নতুন নতুন দেশকে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থায় কবলিত করতে চাইছে। তাদের লক্ষ্য অনগ্রসর দেশগুলির সম্পদ লুট করা এবং সাধারণ-ভাবে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলকে দস্যুবৃত্তির দ্বারা আত্মসাৎ করা।

ভিয়েৎনামে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র এবং নাপাম বোমা, জীবাণু এবং বিষাক্ত গ্যাসের সর্বপ্রকার ঘৃণ্য অস্ত্র প্রয়োগ করে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদী দেশ যখন একটা জাতির ওপরে বছরের পর বছর ধরে নির্মম নিষ্ঠুর বর্বরতা সংঘটিত করে চলেছে তখন এইসব তথাকথিত মহৎ মানবতাবাদীদের কণ্ঠে তার কোনো প্রতিবাদ নেই। শুধু কি তাই, ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেই এইসব মানবতাবাদীদের কণ্ঠ প্রশ্ন করে বসেছে, "ভিয়েৎকঙদের আক্রমণের শিকার ভিয়েৎনামের বেসামরিক লোকজনদের সাহায্যের জন্যে ভারত সরকার কি করছেন?" আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বছরের পর বছর ধরে একটা স্বাধীনতাকামী দেশের মানুষকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে চলেছিল, আকাশ থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলে প্রতিদিন মানুষকে গৃহহারা স্বজনহারা করছে তখন এইসব মানবতাবাদীদের কণ্ঠে এ আবেদন ধ্বনিত হয় না যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের শিকার ভিয়েতনামের লোকজনের সাহায্যের জন্যে ভারত সরকার কি করছেন! দেশের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধারা যখন পররাজ্য আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হেনে তাদের পরাজিত করে তখনই আমাদের মানবদরদীদের কণ্ঠ দরদে ভিজে ওঠে এবং তখন আমাদের সরকার ঘোষণা করেন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কন্‌সাল জেনারেলের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা মানবতার খাতিরে দশ হাজার টাকার ঔষধপত্র এবং গুঁড়ো দুধ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশে অনেক মানব-দরদী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী আছেন তাঁদের মুখোশও এ ব্যাপারে খুলে পড়ছে। তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব, সন্তোষ ঘোষ সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছেন ভিয়েৎনামে তাঁদের কবর রচিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন বীভৎস বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৯০৫ সালের রাশিয়ার স্বৈরাচারী মন্ত্রী স্টলিপিনকে ধন্যবাদ দিয়ে তখনকার বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা যেমন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল এঁরাও হয়ত তেমনি লিখতে পারলে খুশী হবেন যে, 'হে মহান্ জনসন-ম্যাকনামারা চক্র, তোমরা যে বোমা বন্দুক এবং নিষ্ঠুর বর্বরতার মধ্য দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করছ তার জন্যে তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

গোর্কি বলেছেন, আসলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ কার্যক্ষেত্রে সর্বত্রই একটা প্রতারণার ছদ্মবেশ। মানব-সংস্কৃতির ভিতটাকেই এরা আক্রমণ করে এবং তাকে অস্বীকার করতে চায়। বলা বাহুল্য সংস্কৃতির ভিত হল শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রম। বুর্জোয়া মানবতাবাদ একদিকে যেমন ছদ্মবেশ অপর দিকে আবার

তেমনি একটি সুচতুর উপায়ও বটে, যার দ্বারা বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায় থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংগ্রহ করে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে তাদের নিয়োগ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণী শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় ফ্যাসিবাদের এবং এই ফ্যাসিবাদ পাইকারী-হারে নরহত্যার আয়োজন করে এইটেই প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল আদর্শের সঙ্গে মানবতাবাদের শুধু যে সম্পর্ক নেই তাই নয়, মানবতাবাদ বুর্জোয়া আদর্শের প্রতিকূল। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকারে পরিণত করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়, আবার তারই পাশাপাশি দেখতে পাই পশুর প্রতি প্রীতি (মানবতাবাদ ?) দেখাবার জন্যে তারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন একটা খবর, "ইংলণ্ডে সারে-এর একটা শহরে কুকুরদের জন্যে একটা খাবারের দোকান খোলা হয়েছে। এই দোকানে সব কুকুরের জন্যে খাবার বিক্রয় করা হয় এবং গৃহহীন ক্ষুধার্ত কুকুরদের জন্যে বিনা পয়সায় খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দোকানটা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মৃত মি. জেমস্ প্যাটার্সন বলে একজন ব্যক্তির উক্ত উদ্দেশ্যে দান করা টাকায় চালানো হচ্ছে।"

গোর্কি এই ঘটনার ওপর মন্তব্য করে বলেছেন যে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বুর্জোয়া শোষণের ফলে বেকারত্ব এবং অনাহারের কবলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেখানে প্যাটার্সনের মতো ধনিক সমাজের প্রতিনিধিরা এই পশুপ্রীতি প্রদর্শন করে আসলে শ্রমজীবী মানুষকেই অপমান করেছে। লোকটা মরে যাবার সময়েও বুর্জোয়া সভ্যতার অন্তর্গত নোংরামি যতখানি করে যাওয়া সম্ভব করে গেছে, শ্রমজীবী মানুষের ওপর সে এইভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

আসল কথা বুর্জোয়ারা কখনো মানবিক চেতনার অধিকারী হতে পারে না, ইতর পশুবৃত্তি ছাড়া মানবিক কোনো বৃত্তিই তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করে অর্জিত টাকা যদি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে দান করে তবে সেটা তারা করে নিজেদের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবার জন্যে। শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে টাকাটাই বড় এবং ব্যক্তি মানুষের থেকে তাদের কাছে টাকার মূল্য অনেক বেশী। সেই ব্যক্তি মানুষ যত বেশী প্রতিভাবান এবং মহৎ লোকই হোন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

এর পরে গোর্কির বক্তব্য আরও তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানবতাবাদের আদর্শ শ্বাপদ নেকড়ে এবং শুয়োরদের বোধশক্তির বাইরে, এবং পৃথিবীতে কেবল একটি শ্রেণী আছে যে মানবতাবাদের যুক্তি বুঝতে সক্ষম, সেই শ্রেণীটি হলো সর্বহারা শ্রেণী। সর্বহারা শ্রেণীই হলো মানবতাবাদের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের প্রতি সহানুভূতিশীল।

বুর্জোয়া সমাজ তার বিশেষ চরিত্রের জন্যেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ মানুষের ওপর অত্যাচার না করে এবং মানুষে মানুষে শত্রুতার সৃষ্টি

না করে সে সমাজ বেঁচে থাকতে অক্ষম। এই কথা বলে গোর্কি বলেছেন, আমাদের চেষ্টা পরিচালিত হবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে যে অফুরন্ত মানসিক শক্তি এবং প্রতিভা মজুত আছে তাকে বাধামুক্ত করে দেওয়ার দিকে। যথার্থ মানবতাবাদ হচ্ছে সর্বহারার মানবতাবাদ যা' এই পৃথিবীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিটাকেই পরিবর্তিত করে দেবার সুমহান্ আদর্শকে মানুষের সামনে উপস্থিত করেছে।

সর্বহারার কাছে ব্যক্তি মানুষই হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। যদি কেউ সামাজিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর প্রবণতা দেখায় এবং কোনো সময় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বিপজ্জনক কাজকর্ম করেও থাকে তবু সর্বহারা শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে তাকে জেলে কলুষিত নিষ্কর্মা জীবনের মধ্যে ফেলে রাখা হয় না। বরং তাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়, যাতে সে একজন দক্ষ শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে এবং সমাজের একজন যোগ্য সদস্য হতে পারে। অপরাধীদের প্রতি এই যে মনোভাব— গোর্কি একে সর্বহারার সক্রিয় মানবতাবাদ বলে অভিহিত করেছেন, এর অস্তিত্ব আগে কখনো ছিল না। যে সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের নেকড়ের সম্পর্ক সেই সমাজে থাকতেও পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রে অল্পদিনে যে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার মূল ভিত্তি এবং পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে সর্বহারার মানবতাবাদের বিশাল সৃজনীক্ষমতা—এই মানবতাবাদ মার্কস-এঙ্গেল্‌স-লেনিনের মানবতাবাদ। ইউরোপ এবং আমেরিকার বেনিয়া সভ্যতায় যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত বেকার বাহিনীকে পুষ্ট করছে, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে দেশের তাবৎ লোককে কর্মে নিয়োগ করেও আরও কাজের লোকের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে; গোর্কি তাই বলেছেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং সর্বহারার মানবতাবাদের মধ্যে নামের দিক দিয়ে ছাড়া আর কোনো দিক থেকে মিল নেই। দুটিকেই বলা হয় মানবতাবাদ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়গতভাবে তাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে। পাঁচশত বছর আগে বুর্জোয়ারা যখন প্রথম মানবতাবাদের কথা বলেছিল, তখন সেটা ছিল সামন্তশক্তি এবং চার্চের বিরুদ্ধে তাদের আত্মরক্ষার একটা উপায় বিশেষ। এই চার্চ আবার বুর্জোয়াদেরও আধ্যাত্মিক নেতা। যখন মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানুষ সমান এই কথা বুর্জোয়া শ্রেণী বলল তখন আসলে তারা সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের সমানত্বের কথাই বলল। রাজার পারিষদবর্গ অথবা বিশপের সাদা জোব্বার সঙ্গে নিজেদের সমান অধিকারের দাবী জানানো বুর্জোয়া মানবতাবাদ কিন্তু পরবর্তীকালে দাসত্ব এবং দাস ব্যবসায়ের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করল। বুর্জোয়ারা কি সত্যিই কখনো চার্চ এবং সামন্তশ্রেণীর দ্বারা অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর পাশবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করেছে? শ্রেণী হিসেবে কখনো করেনি। ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর কেউ কেউ করেছে, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীই আবার

পরবর্তীকালে তাদের নির্মূল করেছে। অতীতে এই বুর্জোয়া মানবতাবাদীরাই সর্ব প্রযত্নে সামন্তশ্রেণীকে সাহায্য করেছে —ওয়াট টাইলারের সৈন্যবাহিনীকে কৃষকদের নির্মূল করতে। এই ভদ্রবেশী বেনেরা বিংশ শতাব্দীতে শান্ত মস্তিষ্কে ভিয়েনা, এ্যান্টোয়ার্প, বার্লিন, স্পেন, ফিলিপাইন, ভারতবর্ষ এবং চীনের রাস্তায় রাস্তায় নিষ্ঠুরভাবে শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করেছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় দশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করেছে এবং ভিয়েৎনামের বুকের ওপর দীর্ঘকাল বর্বর হত্যালীলা চালিয়ে গেছে।

এই সমস্ত ঘৃণ্য অপরাধগুলো কি প্রমাণ করে না যে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে মানবতাবাদ জিনিসটার অস্তিত্ব এখন ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়ে গেছে? আজকাল আর মানবতাবাদ কথাটার বিশেষ উল্লেখ করতে দেখা যায় না, কারণ সম্ভবত তারা অর্থাৎ বুর্জোয়ারা এটা বুঝতে পারছে যে, প্রতিদিন শহরের রাস্তায় ক্ষুধার্ত শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা, শ্রমজীবী মানুষকে দিয়ে জেলখানা বোঝাই করা এবং তাদেরই মধ্যেকার চেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর এবং সক্রিয়দের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এবং হাজার হাজার লোককে নির্বাসন দিয়ে আবার একই সঙ্গে মানবতাবাদের কথা বলা যায় না।

সাধারণত বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভাগ্যের বোঝাকে কখনই লাঘব করবার চেষ্টা করে না। তারা যেটা করে থাকে বা দিয়ে থাকে তাকে বলা যায় দান বা ভিক্ষা, যেটা শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার পক্ষে অপমানকর। কার্যক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদের আসল রূপটা হলো প্রবঞ্চনা —যার অর্থ হলো দস্যুবৃত্তির দ্বারা যাদের সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের কিছু ভিক্ষা প্রদান। সেই যে ভণ্ডামিতে পূর্ণ একটা ধর্মীয় অনুশাসন আছে, 'তোমার ডান হাত যেন না জানতে পারে তোমার বাঁ হাত কি করছে।' ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে ভিক্ষুক বা দরিদ্রকে বলা হয়েছে 'নারায়ণ', আর দরিদ্রকে কিছু দান করাকে বলা হয়ে থাকে নারায়ণকে সেবা করা। আগে অমানুষিক অর্থ নৈতিক শোষণ এবং বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে দরিদ্রে পরিণত করা হলো এবং তারপর সেই দরিদ্রকে দেওয়া হলো 'নারায়ণ'-এর মর্যাদা। মানুষের জীবনের এই প্রভুরা, অর্থাৎ এই বুর্জোয়া শ্রেণী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে এবং তারপর সামান্য কয়েকটি তুচ্ছ পয়সা স্কুল, হাসপাতাল এবং হয়ত কোনো স্বাস্থ্যাবাসে দান করছে। এই ভদ্রবেশী বর্বরদের সাহিত্যে প্রচার করা হয়, 'অধঃপতিতদের প্রতি দয়া বা করুণা' —কিন্তু অধঃপতিত কারা? বুর্জোয়া শ্রেণী দস্যুবৃত্তি করে যাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, যাদের ভগ্নোদ্যম করেছে এবং কাদায় ফেলে মাড়িয়েছে তারাই এই তথাকথিত অধঃপতিত!

গোর্কি এরপর বলেছেন, যদি বুর্জোয়াদের মানবতাবাদের মধ্যে সততা থাকত তবে তারা যে জনসাধারণকে দাসে পরিণত করেছে তাদের মধ্যে মানবিক

মর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে চাইত, তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে সচেতন করত, এবং প্রাকৃতিক শক্তির ওপর জয়ী হয়ে সমগ্র জগৎকে গড়ে তুলবার যে মহৎ শক্তি তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত মহিমা জাগাতে চাইত। যদি তাদের মানবতাবাদ আন্তরিক হতো তবে তারা 'দুঃখকষ্ট থাকবেই, তাকে রোধ করা যায় না।' —এই ধরনের নীচ আদর্শ শ্রমজীবী মানুষের মনে প্রবিষ্ট করাতে চাইত না। তা'হলে তারা মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক সমবেদনা না জানিয়ে সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রতি, বিশেষ করে অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক কারণে যে দুঃখকষ্ট তার প্রতি মানুষের সক্রিয় ঘৃণা সৃষ্টি করত। বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী-বৈষম্য মনুষ্য সমাজকে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শ্বেতবর্ণ-কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত করেছে। দুঃখকষ্ট সহ্য করবার আদর্শ প্রচার করে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা আমাদের এই শ্রেণী-বৈষম্যের অপমানকর বেদনার প্রতি সহনশীল করে তুলতে চায়, বোঝাতে চায় এই বেদনা অনতিক্রমণীয় এবং চিরস্থায়ী।

বুর্জোয়া মানবতাবাদ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য এমনি ভাবে উপস্থিত করবার পর গোর্কি সর্বহারার মানবতাবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, বিপ্লবী সর্বহারার মানবতাবাদ হচ্ছে অতি স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। এই মানবতাবাদ 'প্রতিবেশীকে ভালো-বাস' —এই ধরনের উচ্চগ্রামের মধুমাখা কথা বলে না। এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীকে পুঁজিপতি শ্রেণীর লজ্জাজনক, রক্তলোভী এবং উন্মত্ত শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করা, জনগণকে এই কথা শেখানো যে, তারা কেনাবেচার পণ্য নয়, বুর্জোয়াদের সোনা এবং বিলাসদ্রব্য সৃষ্টির কাঁচামাল নয়। সর্বহারার মানবতাবাদ কাব্যিক ভালোবাসার বুকনি আওড়ায় না, সে দাবি করে যে, প্রতিটি শ্রমিক তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি করুক, উপলব্ধি করুক যে তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অধিকার আছে, বিশেষ করে পুঁজিপতিরা যখন নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত করছে তখন সেই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাবার দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছে এটা তারা উপলব্ধি করুক।

গোর্কি বলেছেন, সর্বহারার মানবতাবাদ দাবি করে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি চিরস্থায়ী ঘৃণা। পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তাদের পদলেহীদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে; পরজীবী, ফ্যাসিষ্ট এবং কসাইদের বিরুদ্ধে; শ্রমজীবী মানুষের প্রতি যারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে; সমস্ত কিছুই যা জনগণের দুঃখকষ্ট সৃষ্টির জন্যে দায়ী তার বিরুদ্ধে এবং কোটি কোটি লোকের ক্লেশ দুঃখের জন্যে যারা দায়ী তাদের সকলের বিরুদ্ধে সর্বহারার মানবতাবাদ ঘৃণা দাবি করে। শুদ্ধ সহজ সৎ মানবিক বিচার আমাদের এই কথাই বলে যে, যারা শ্রম করে শ্রমের ফলের ওপর তাদেরই অধিকার থাকা উচিত, যারা কেবল সেগুলি করবার জন্যে হুকুম জারি করে তাদের কোনো অধিকার থাকবে না।

বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন, বুর্জোয়াদের জীবন, তাদের আচার-ব্যবহার বুর্জোয়া সাংবাদিকেরা যেভাবে চিত্রিত করে তা' যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি বিরক্তিকর। রক্ত-মোক্ষণকারী নোংরা খুনীদের সমাজে বাস করতে করতে তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। তারা এই ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে সেই সমাজের নৃশংসতা, নোংরামি ইত্যাদি একেবারে নির্লজ্জের মতো বর্ণনা করে যায়। তাদের উদ্দেশ্য পাঠকদের দৃষ্টি বিপথে নিয়ে যাওয়া যাতে পাঠকেরা অপরাধের বর্ণনা পড়তে পড়তে আরও নির্লজ্জ এবং নির্বোধে পরিণত হয়। বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় সাহিত্য হচ্ছে অপরাধ-মূলক উপন্যাস (**crime novel**)।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের একটা বিশেষ প্রচারক দল হলো **Pacifist** বা শান্তিবাদীরা। এরা শান্তি চায় —কিন্তু কাদের মধ্যে ? শোষক ধনিক শ্রেণী এবং শোষিত নিঃস্ব শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। তা'হলে কি তারা দেখতে পায় না ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ কিভাবে অনাহার-মৃত্যু বরণ করছে এবং অপরদিকে ধনিক শ্রেণী এবং সামন্ত শ্রেণীর ঐ শোষণের মাধ্যমে সঞ্চিত ধন কিভাবে দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে ? না, এদের শান্তিবাদ তথা মানবতাবাদ শোষক এবং শোষিতে তফাৎ দেখতে পায় না। এরাও তাই জনসাধারণকে প্রতারণা করে এবং বিত্তবানদেরই সেবা করে।

এই শান্তিবাদীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন, পুঁজিপতি শ্রেণী যখন সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোককে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে হত্যা করছে, জাপান যখন চীন ভূখণ্ডে লুটপাট চালাচ্ছে এবং সাংহাই-এর মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংস করছে তখন এইসব অপরাধমূলক কার্যকলাপ শান্তিবাদীদের মনে ঘৃণা জাগায় না। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। এমন কি এই ঘটনাগুলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে বলেও মনে হয় না। এই বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও শান্তিবাদীদের চোখের সামনে সারা পৃথিবীর বুকে পুঁজিবাদীদের এই সব জঘন্য অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। এই শান্তিবাদীরা কিন্তু নির্বোধ নয়। তারা জানে যে, আমেরিকায় শ্রমিকরা যখন অনাহারে মরছে তখন সেখানকার পুঁজিপতিরা গমের চাপড়া তৈরী করে ইঞ্জিন এবং বয়লারে জ্বালানির কাজ চালাচ্ছে। এইসব পৈশাচিক সত্য ঘটনা সত্ত্বেও শান্তি-বাদীদের চোখে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না। পুঁজিবাদী দেশের রাস্তায় রাস্তায় প্রতিদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটছে, শ্রমিকদের হত্যা করা হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিদ্বেষভরে বুর্জোয়ারা গৃহযুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। এতে করে শান্তিবাদীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে ? পুঁজিবাদীদের এই বিদ্বেষ এবং যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে শুধু বক্তৃতাবাজী ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোনো বাধাই আসছে না। শান্তিবাদীদের যে আসল উদ্বেগটা কোথায় সত্যিই সেটা বুঝে ওঠা মুশকিল।

সম্ভবত তাদের উদ্বেগের একমাত্র কারণ হলো এই যে, তারা হচ্ছে বুর্জোয়াদের সৈন্য বাহিনীর পশ্চাদ্‌বাহিনী এবং সেনাপতিরা তাদের এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞে পশ্চাতের এই মৃদু-স্বভাব স্বজনদেরও তারা রেয়াত করবে না।

সাধারণত এই মানবতাবাদীরা অর্থাৎ শান্তিবাদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ ঘটনার পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ ইতিহাসের গতির পেছনে অবস্থান করছে এবং তাদের প্রধান কামনা হচ্ছে এই সমাজ-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং আত্মসংরক্ষণ। যখন সেই অবশ্যম্ভাবী শেষ যুদ্ধ ঘটবে, যে যুদ্ধ সমস্ত জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের চিরতরে অবসান ঘটাবে তখন এই শান্তিবাদীরা কি ভূমিকা নেবে সেটা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

এই শান্তিবাদীরা এবং মানবতাবাদীরা মানবিক সংস্কৃতির কে যে শত্রু তা' দেখতে পায় না। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধের উন্মাদনায় নিজেদের সঁপে দিয়েছিল।

বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের উদ্দেশ্য করে গোর্কি তাই সেই নির্মম রূঢ় সত্যটাকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এখন সেই সময় এসেছে যখন তোমরা যদি বাস্তববাদী হতে চাও তবে তোমাদের বোঝা উচিত যে, পৃথিবীতে দুটো ঘৃণা পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। একটা বুর্জোয়া দস্যুদের মধ্যে, তার রূপ হলো পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের ভবিষ্যতের ভয়। অপরটি হলো সর্বহারাদের ঘৃণা, যেটা বর্তমান জীবনের প্রতি তাদের ঘৃণা থেকে সরাসরি উদ্ভূত। এই দুটি ঘৃণা এমন তীব্রতার স্তরে পৌঁছেছে যে, কোনো কিছুই আর তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে সর্বহারা শ্রেণী এবং সেই বিজয় পৃথিবীকে চিরতরে ঘৃণার হাত থেকে মুক্তি দেবে। এই সমাধান ছাড়া এই দুই পারস্পরিক ঘৃণার আর কোনো সমাধান সম্ভব নয়।